বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সেলিম
প্রফেসর ড. সুলতানা নিগার চৌধুরী
প্রফেসর প্রদ্যুত কুমার ভৌমিক

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২০
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণির মানবিক শাখায় **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা** একটি নৈর্বাচনিক বিষয়। স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তার দেশ ও জাতির ধারাবাহিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানা জরুরি। ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়। ইতিহাসচেতনা একজন নাগরিককে নিজ দেশের সামাজিক পটভূমি, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা, ঐতিহ্য ও বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারে। **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা** পাঠ্যপুস্তকটিতে মানবিক বোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক বিশ্বনাগরিক গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ইতিহাস পরিচিতি	১-৭
দ্বিতীয়	বিশ্বসভ্যতা	৮-৩১
তৃতীয়	প্রাচীন বাংলার জনপদ	৩২-৩৬
চতুর্থ	প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৩২৬-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)	৩৭-৪৮
পঞ্চম	প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস	৪৯-৫৭
ষষ্ঠ	মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)	৫৮-৮১
সপ্তম	মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস	৮২-৯৫
অষ্টম	বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব	৯৬-১০৮
নবম	ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	১০৯-১২১
দশম	ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন	১২২-১৪২
একাদশ	ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ	১৪৩-১৫২
দ্বাদশ	সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮–১৯৬৯)	১৫৩-১৬৪
ত্রয়োদশ	সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ	১৬৫-১৮৬

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাস পরিচিতি

প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী জাতিসত্তার পরিচয় জেনে গৌরব বোধ করে। বাংলাদেশেরও আছে গৌরব করার মতো ইতিহাস, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, বিজয় ছিনিয়ে আনার ইতিহাস। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিতে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম হয়েছে একটি নতুন স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ। বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে ও আত্ম-অনুসন্ধান করতে এবং জাতির পরিচয় অনুসন্ধান করতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে, চর্চা করতে হবে। কারণ ইতিহাস ঘটনার অনুসন্ধানকৃত, গবেষণালব্ধ, প্রতিষ্ঠিত সত্য উপস্থাপন করে। এজন্য ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করতে হলে ইতিহাসের উপাদান ও প্রকারভেদ সম্পর্কেও জানতে হবে।

এজন্য আগে আমাদের জানতে হবে ইতিহাস কী? জানতে হবে কত ধরনের ইতিহাস লেখা যায় বা ইতিহাস কত ধরনের হয়। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এই অধ্যায়ে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র-১ : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বাঙালির মুক্তির বিজয়-উল্লাস

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা, স্বরূপ ও পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইতিহাসের উপাদান ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারব;
- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী হব।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা

'ইতিহাস' শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে; যার অর্থ 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। ই. এইচ. কার-এর ভাষায় বলা যায়, ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।

বর্তমানের সকল বিষয়ই অতীতের ক্রমবিবর্তন ও অতীত ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর অতীতের ক্রমবিবর্তন ও ঐতিহ্যের বিবরণই হলো ইতিহাস। তবে এখন সমসাময়িক কালের ইতিহাসও লেখা হয়, যাকে বলে সাম্প্রতিক ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাসের পরিসর সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইতিহাস শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে এরূপ দাঁড়ায়, ইতিহ + আস। যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ড. জনসনও ঘটে যাওয়া ঘটনাকেই ইতিহাস বলেছেন। তাঁর মতে, যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস। যা ঘটে না তা ইতিহাস নয়।

চিত্র-২ : হেরোডোটাস

গ্রিক শব্দ 'হিস্টরিয়া' (Historia) থেকে ইংরেজি হিস্টরি (History) শব্দটির উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস। 'হিস্টরিয়া' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক)। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণাকর্মের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেন, যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো– যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। তিনি তাঁর গবেষণায় গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন। এতে তিনি প্রাপ্ত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং গ্রিসের বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান– এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন। ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্যনির্ভর এবং গবেষণার বিষয়ে। ইতিহাসবিদ র‍্যাপসন বলেছেন, ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা।

আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন্‌ র‍্যাংকে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস। ইতিহাস বিদ্যমান তথ্য ও প্রমাণ যাচাইসাপেক্ষে লেখা হয় বটে, তবে সব সময়ই নতুন তথ্য-প্রমাণ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলের সাপেক্ষে পুনর্লিখিত হবার সুযোগ থাকে।

ইতিহাসের উপাদান

যেসব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাকেই ইতিহাসের উপাদান বলা হয়। ইতিহাসের উপাদানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান।

১. লিখিত উপাদান

ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মেও তৎকালীন সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন : বেদ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী', আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরী' ইত্যাদি।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবনে বতুতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

চিত্র-৩ : হিউয়েন সাং

সাহিত্য উপাদান

(ক) জীবনী গ্রন্থ : সন্ধ্যাকর নন্দীর– 'রামচরিত', বানভট্টের 'হর্ষ চরিত' চর্যাপদ, মঙ্গল কাব্য ইত্যাদি

(খ) দেশীয় সাহিত্য : কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', কালিদাসের 'মেঘদূত' ইত্যাদি।

(গ) বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী : মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা', ফা-হিয়েনের 'ফো-কুয়ো-কি'; হিউয়েন সাং-এর 'সি-ইউ-কি' ইবনে বতুতার 'রিহলা' ইত্যাদি।

(ঘ) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ : রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, পুরাণ ইত্যাদি।

(ঙ) অন্যান্য : প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, সন্ধি-চুক্তি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ফেরদৌসীর শাহনামা ইত্যাদি।

২. অলিখিত উপাদান: প্রত্নতাত্ত্বিক

যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই, সেই বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদান।

(ক) লিপিমালা : সরকারি লিপি: যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিদান, রাজার আদেশ, রাজার নাম, রাজ্য জয়, রাজত্বকাল, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।
বেসরকারি লিপি : এগুলো সাধারণত পাথরে মন্দিরের গায়ে লেখা হতো।

চিত্র-৪.১ : চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা

চিত্র-৪.২ : শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা

(খ) মুদ্রা : মুদ্রায় রাজার নাম, সন-তারিখ, রাজার মূর্তি, নানা দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা থাকত। যা থেকে রাজার সময়কাল, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সমাজব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

(গ) স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ : প্রত্নকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন সমাধি, স্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাচীন শিল্পকীর্তি, দেব-দেবীর মূর্তি, মৃৎশিল্প, মৃৎপাত্র ও তৈজসপত্রাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত। যেগুলো থেকে সভ্যতার উৎকর্ষ যেমন বোঝা যায়, তেমনি এতে নাগরিক জ্ঞানের সৌন্দর্যভাব ও সাংস্কৃতিক মনোভাবও ফুটে ওঠে।

চিত্র-৫ : উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শন-রৌপ্য মুদ্রা ও পাতিল

(ঘ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি, নরসিংদীর 'উয়ারী-বটেশ্বর' ও বাগেরহাটের 'ষাট গম্বুজ' মসজিদ ইত্যাদি।

২০১৮

(ঙ) প্রচলিত বিশ্বাস বা প্রথা : কিংবদন্তী, রূপকথা, গান, কাহিনিমালা, বেদ ইত্যাদি। বেদ প্রথম দিকে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এজন্য একে 'শ্রুতি' বলা হতো। পরবর্তীকালে একাধিক রচয়িতা যেমন: ঋষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, বামদেব, ভৃগু প্রমুখ দীর্ঘদিন ধরে বেদ রচনা করেন।

(চ) পুঁথি : একসময় পুঁথিও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

এ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা সম্ভব প্রাচীন অধিবাসীদের সভ্যতা, ধর্ম, জীবনযাত্রা, নগরায়ণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় সিন্ধু সভ্যতা, বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি ইত্যাদি স্থানের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের কথা। নতুন নতুন প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ইতিহাস। যেমন- সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক ধারণা। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নতুন ভাবে লিখতে হবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস।

একক কাজ : ইতিহাস অনুসন্ধান কোন কোন উপাদানের সাহায্যে করা যায় লিখ।

ইতিহাসের প্রকারভেদ

মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বিষয়ের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। ফলে সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিসর। ইতিহাস বিরামহীনভাবে অতীতের ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়। সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা কঠিন। তাছাড়া ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে মানুষ, মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও জীবনধারা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং পরিপূরক।

তারপরও পঠন-পাঠন, আলোচনা ও গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে ইতিহাসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ভৌগোলিক অবস্থানগত ও বিষয়বস্তুগত ইতিহাস।

১. ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস : ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বোঝার সুবিধার্থে ইতিহাসকে আবারও তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা– স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

২. বিষয়বস্তুগত ইতিহাস : কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস রচিত হয়, তাকে বিষয়বস্তুগত ইতিহাস বলা হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুগত পরিসর ব্যাপক। সাধারণভাবে একে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ইতিহাস।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

মানবসমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রমাণ ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ঐতিহাসিক ভিকো (Vico) মনে করেন, মানব সমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যা মানবসমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা সবই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। যেমন– শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন প্রভৃতি বিষয়, সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা-ই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

ইতিহাস জ্ঞান অর্জনের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা। এর রচনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতিও ভিন্ন। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রথমত. তথ্যের সাহায্যে অতীতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাদান করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত. ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানবসমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক তথ্যনির্ভর বিবরণ।

তৃতীয়ত. ইতিহাস থেমে থাকে না, এটি গতিশীল এবং বহমান। যে কারণে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিকযুগ সন-তারিখ ব্যবহার করে ভাগ করা কঠিন। আবার পরিবর্তনের ধারাও সব দেশে একসঙ্গে ঘটেনি।

চতুর্থত. ঘটে যাওয়া ঘটনার সঠিক বিবরণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। তবে ঘটনার নিরপেক্ষ বর্ণনা না হলে সেটা সঠিক ইতিহাস হবে না।

একক কাজ : সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য– ব্যাখ্যা কর।

ইতিহাসের পরিসর

মানুষ যাপিত জীবনের সকল বিষয় ইতিহাসের আওতাভুক্ত। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম– যত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, ইতিহাসের সীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন– প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের মানুষের কর্মকাণ্ড খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সে সময় ইতিহাসের পরিসরও খাদ্য সংগ্রহমূলক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে ইতিহাসের শাখা-প্রশাখাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিস্তৃত হচ্ছে ইতিহাসের সীমানাও। উনিশ শতকে শুধু রাজনীতি ইতিহাসের বিষয় হলেও মার্কসবাদ প্রচারের পর অর্থনীতি, সমাজ, শিল্পকলাসহ জনজীবনের সামগ্রিক ইতিহাসও রচিত হতে থাকে। চৌদ্দ শতকের ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন মানুষের গোষ্ঠী জীবন, সংস্কৃতি, উৎপাদন প্রণালীকে ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়ে পরিণত করেন। এভাবে একের পর এক বিষয় ইতিহাসভুক্ত হচ্ছে আর সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিধি ও পরিসর।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের গবেষণালব্ধ উপস্থাপনই ইতিহাস। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারি। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি।

জ্ঞান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে : অতীতের বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশ জানার মাধ্যমে আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধি করে: ইতিহাস-জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে সে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দেয় : ইতিহাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ইতিহাস পাঠ করলে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ জন্মে।

> **দলীয় কাজ :** তোমার এলাকার অথবা কাছাকাছি কোনো ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন পরিদর্শন করে তার ঐতিহাসিক উপাদানগুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাকে আধুনিক ইতিহাসের জনক বলা হয়?

ক. হেরোডোটাস খ. লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে

গ. টয়েনবি ঘ. ই. এইচ. কার

২. উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনসমূহ প্রমাণ করে—

i. প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ মৃৎশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল;

ii. বহু প্রাচীন আমলে বাংলাদেশে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে;

iii. প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমা ঈদের ছুটিতে মা-বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতি জাদুঘর পরিদর্শনে যায়। সেখানে সে মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত ইত্যাদি দেখতে পায়।

৩. রিমা ময়নামতি জাদুঘরে ইতিহাসের যে উপাদান দেখতে পায় তা হলো—

i. লিখিত

ii. অলিখিত

iii. প্রত্নতত্ত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. রিমা ময়নামতি জাদুঘর পরিদর্শন করে জানতে পারবে, প্রাচীন বাংলার—

i. সামাজিক ইতিহাস

ii. অর্থনৈতিক ইতিহাস

iii. সাংস্কৃতিক ইতিহাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সজল তার মামার সাথে গণগ্রন্থাগারে যায়। সেখানে সে বিভিন্ন বইপত্র পড়ে। সজল বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইতিহাসের বই তার ভালো লাগে। সে বিভিন্ন উৎস থেকে ইতিহাসের বইপত্র সংগ্রহ করে পড়ে। এসব দেখে সজলের এক বন্ধু তাকে বললো, শুধু শুধু এসব বই পড়ে সময় নষ্ট করছিস কেন?

ক. হিউয়েন সাং কোন দেশের পরিব্রাজক?

খ. সময়ের বিবর্তনে কীভাবে ইতিহাসের পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে?

গ. সজল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান দেখতে পায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি সজলের বন্ধুর মানসিকতার সাথে একমত? যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বসভ্যতা

আদিম যুগের মানুষ কৃষিকাজ জানত না। শিকার ও সংগ্রহ নির্ভর সমাজ ছিল। এরপর মানুষ আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করে। পাথর ভেঙে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। পাথর যুগের এই সময়কে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে পুরোনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ, মধ্যপলীয় ও নবপলীয় যুগ। নবপলীয় যুগ শেষভাগে উদ্যান কৃষি, পশুপালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষ আপাত স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে নদী অববাহিকায় কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে। এভাবেই মানবসভ্যতার শুরু।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারায় মানুষ ধীরে ধীরে একটি জটিল সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়। উপযুক্ত নগরায়ন, স্থাপত্য, লিখন পদ্ধতি, জাতিসত্তার পরিচয়, সরকারব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসনসহ আরও নানা উৎকর্ষ মানুষ, যা তার সভ্যতা নামে পরিচিত তৈরি করেছে। প্রখ্যাত ইতিহাস গবেষক আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবি তাঁর 'এ স্টাডি অব হিস্ট্রি' গ্রন্থে সভ্যতার উত্থানপর্বের নানা বিষয় সুস্পষ্ট করে লিখেছেন। তিনি মনে করেন বিশ্বসভ্যতার উদ্ভব হয়েছে বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ তথা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে গিয়ে। বিশ্বের নানা স্থানে বিকশিত সভ্যতা হিসেবে মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু, মিসর, চিন, গ্রিক, রোম, মায়া, ইনকা কিংবা অ্যাজটেক সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মেসোপটেমিয়া সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার, নগরায়ন ও স্থাপত্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- মিসরীয় সভ্যতার নানা অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চৈনিক সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গ্রিক সভ্যতা কেনো বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রোমান সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- মায়া সভ্যতার বিশেষ দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ইনকা সভ্যতার অর্জনগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- অ্যাজটেক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে পারব।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা

'মেসোপটেমিয়া' এসেছে গ্রিক শব্দ মেসোস (Mesos) তথা 'মধ্যবর্তী' এবং পটামোস (Potamos) অর্থাৎ 'নদী' থেকে। সহজ বাংলায় বলতে পারি 'মেসোপটেমিয়া' অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি'। দজলা ফোরাত কিংবা টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস যাই বলা হোক, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার বিস্তার দুটি নদীর মাঝখানে অবস্থিত পলল বিধৌত উর্বর ভূমিতে। মানচিত্রের মাঝে এই উর্বর ভূমিরূপকে দেখাতো অনেকটাই অর্ধচন্দ্র তথা বাঁকানো চাঁদের মতো। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'। মূলত ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন আর জর্দান মিলেই এই ফার্টাইল ক্রিসেন্টের বিস্তার। অনেকে কুয়েতের উত্তরাংশ এবং তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাশাপাশি ইরানের পশ্চিম দিকের একাংশকে এই উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতির ভূমিরূপ তথা ফার্টাইল ক্রিসেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

'মেসোপটেমীয়' অঞ্চলের মানচিত্র

মূলত সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয় এবং ক্যালডীয় সভ্যতার সম্মিলিত রূপকেই আমরা জেনে থাকি মেসোপটেমীয় সভ্যতা হিসেবে। এই সভ্যতা শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের দিকে। বর্তমান ইরাক থেকে শুরু করে ফার্টাইল ক্রিসেন্টের প্রায় পুরোটা ছিল এই সভ্যতার বিস্তার। এই সভ্যতার বিকাশ যে অঞ্চলে ঘটেছিল তার উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরব মরুভূমি, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পার্বত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। উত্তর ও পূর্বদিকে উচ্চ পার্বত্যাঞ্চল মেসোপটেমিয়াকে প্রাকৃতিক প্রাচীরের সুবিধা দিয়েছে। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুমেরীয়, আক্কাদীয়, আমোরাইট, ক্যাসাইট, এসেরীয় এবং ক্যালডীয় জাতিগোষ্ঠী মিলে প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। কৃষির জন্য সেচ আর যাতায়াতের ক্ষেত্রে চাকার আবিষ্কার ছিল এই সভ্যতার জন্য যুগান্তকারী অর্জন।

এই অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলায় প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিল সুমেরীয়রা। পুরাতাত্ত্বিক খনন করে মেসোপটেমিয়ার ইউবেইদ অঞ্চলে কয়েকটি জনবসতি পাওয়া গিয়েছে। ইউবেইদের মতো ওয়ারকা সংস্কৃতি সুমেরীয় ভাষায় ইউরুক (Uruk) ও সেমেটিক ভাষায় ইরেচ (Erech) নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতি আদি সাক্ষরতা যুগের (Protoliterate) মেসোপটেমিয়ার কথা জানান দিচ্ছে। প্রাথমিক যুগের সংস্কৃতি হিসেবে এই ওয়ারকাতে উন্নতমানের মৃৎপাত্র তৈরির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইয়াননায় অবস্থিত দেবতা আনুর (Anu) মন্দির এবং ইউরুক এর জিগুরাট তথা শ্বেত মন্দির এই সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

দজলা ফোরাত নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রাথমিক বিকাশের সময়কাল হিসেবে মনে করা হয় ৩৫০০-৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দকে। তখন এই অঞ্চলের নিচু সমতলে প্রথম সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ধারণা করা হয় ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শেষদিকে কয়েকটি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল। প্রাথমিক দিকের মেসোপটেমিয়াতে গড়ে উঠেছিল কিছু নগররাষ্ট্র। যেমন–উর, ইউরুক, লাগাশ, উম্মা প্রভৃতি। প্রাচীন গ্রামসমূহের চেয়ে আকারে বেশ বড় ছিল এই নগররাষ্ট্রগুলোর। পাশাপাশি এখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রভূমিও গড়ে উঠেছিল।

সভ্যতার মূল অর্জনসমূহ

সভ্যতার উন্মেষপর্ব হিসেবে মনে করা যেতে পারে ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সময়কালকে। এই সময়ের শেষ দিকে মেসোপটেমীয়রা টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদীর পানিকে বাঁধ দিয়ে কৃষিকাজের প্রয়োজনে সেচের জন্য ব্যবহার করতে থাকে। তারা প্রচুর খাল খননের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মূল আবিষ্কারের একটি ছিল চাকা। তারা চাকার ব্যবহার আয়ত্ব করার সেখানে ফসলের গাড়ি চলার জন্য রাস্তা তৈরি করতে হয়েছিল। নগরের মধ্যে নির্মিত বেশিরভাগ রাস্তা ছিল প্রশস্ত।

কৃষি ও পশুপালন

এ অঞ্চলের কৃষকরা কাঠের লাঙল ও পাথরের কুঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের প্রধান উৎপাদিত ফসল ছিল যব। গৃহপালিত পশুর মধ্যে সিংহভাগ ছিল ভেড়া ও ছাগল। তবে পশুপালনের সময় নিরাপত্তাজনিত কারণে রাখালরা অনেক সময় কুকুর ব্যবহার করত। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মাটির দেওয়াল বা খেজুরগাছের বেষ্টনি দিয়ে তার ভেতরে বাগান তৈরি করা হতো। মূলত বাইরের তৃণভোজী জন্তু থেকে তারা এই বাগানকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এসব বাগানে মেসোপটেমীয় অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ফলের গাছ রোপণ করেছিল বলে জানা গিয়েছে। কৃষিভূমি তথা ফসলের মাঠ থেকে বিভিন্ন শহরে ফসল পরিবহণের জন্য স্থলপথে গাধা ছিল তাদের মূল বাহন। তবে পানিপথে তারা নৌকার মতো ছোট-বড় ভেলা ব্যবহার করত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

গণিতের উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মেসোপটেমিয়া সভ্যতার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। পুরোহিতরা ফসল জমা নেওয়ার পর মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে দাগ কেটে তার হিসেব রাখত। তাদের সংখ্যাগুলি ষষ্ঠিক বা ষাট কেন্দ্রিক ছিল। তারা সেখান থেকেই এক ঘণ্টায় ষাট মিনিট ও এক মিনিটে ষাট সেকেন্ডের হিসাব শুরু করেছিল। বছরকে ১২ মাসে এবং এক মাসকে ৩০ দিনে ভাগ করে হিসাব করা শুরু করেছিল তারাই। পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করার পাশাপাশি রাশিচক্রের হিসেব তারাই শুরু করেছিল। ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের পাশাপাশি আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তারা কাচের ব্যবহার শুরু করেছিল।

ভাষা ও সাহিত্য

মেসোপটেমিয়ার মানুষ সেমিটিক ভাষা ব্যবহার করত। তাদের এ ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চলত। এ ভাষার জন্য তারা কিছু অর্থবোধক ছবির মাধ্যমে একটি আদিম লেখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। চিত্রধর্মী এই পদ্ধতিতে কাদামাটির উপর নলখাগড়ার সুঁচালো মাথা দিয়ে লিখে তারা তা শুকিয়ে নিত। আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বের লিখিত বর্ণমালার দলিল পাওয়া গিয়েছে মেসোপটেমীয় থেকে। তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় গিলগামেশ নামের মহাকাব্য রচনা করেছিল।

নগর

নদীর তীরে অবস্থিত মেসোপটেমিয়ার সিংহভাগ শহরের কেন্দ্র ছিল দুর্গবেষ্টিত। দুর্গের দেওয়াল ছিল রোদে শুকানো ইট দ্বারা নির্মিত। এই ইটগুলো পোড়ানোর ক্ষমতা তখনও আয়ত্বে আসেনি তাদের। বিশেষত, ইউরুক শহরে ৬ মাইল দীর্ঘ দুর্গ ঘেরা একটি অঞ্চল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা কিংবদন্তির বীর রাজা গিলগামেশ এই দুর্গ নির্মাণ করেছিল। এই সময়ে নির্মিত বেশির ভাগ নগরে নগর-তোরণ ছিল। প্রতিটি তোরণের সামনে শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাহারা দিত।

আইন ও বিচার

পারস্যের সিপার দুর্গে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে একটি কালো-সবুজ পাথরের তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ। এই পাথরে সংকলিত হয়েছে প্রখ্যাত হাম্মুরাবির আইন। বর্তমানে পাথরের স্তম্ভটি প্যারিসের ল্যুভ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ৮ ফুট উঁচু এই পাথরের উপরের অংশে রয়েছে একটি ভাস্কর্য। এই পাথরের নিচের দিকে লেখা হয়েছে ২৮২টি আইনের ধারা। দেশে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুষ্ট এবং অসৎ লোকদের ধ্বংস করে দুর্বলকে রক্ষা করার প্রয়োজনে এই আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল।

ধর্ম

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের মানুষের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ছিল ঐহিক তথা পার্থিব। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা ছিল না। পরকালের জীবনকে গুরুত্ব দেয়নি বলেই মৃতদেহের সমাধি প্রথা ছিল সাদামাটা। সুমেরীয় ধর্মে নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা কোনোটাই বিশেষ স্থান পায়নি। তারা জীবনমুখী একটি সহজবোধ্য ধর্মের অনুসারী ছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে শহর সংলগ্ন দেবমন্দির। পাহাড়সদৃশ সিঁড়ির ধাপ কেটে তৈরি এই মন্দিরগুলোকে বলা হতো জিগুরাত (Ziggurat)।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মানুষ সূর্য দেবতা শামাশ; বৃষ্টি, বাতাস ও বন্যার দেবতা এনলিল; পানির দেবতা এনকি; প্রেমের উর্বরতার দেবী ইনাননা তথা ইশতার, প্লেগ রোগের দেবতা নারগলের আরাধনা করেছে। দেব-দেবীর উদ্দেশে এরা তেল, মাখন, শাকসবজি, ফল, ফুল, খাদ্য প্রভৃতি উৎসর্গ করত। তাদের প্রধান ধর্মমন্দির জিগুরাতে থাকতেন তাদের পুরোহিত রাজা। ওখানে থেকে তিনি 'পাতেজী' ধর্ম পরিচালনা করতেন।

রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন সময় বহিঃশক্তি এই সভ্যতাকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মধ্য দিয়ে এর রাজনৈতিক ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। তাই এই অঞ্চলের জাতিসত্তা ছিল বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে গড়া। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল সময় ও স্থানভিত্তিতে একটু আলাদা ধারায়।

সিন্ধুসভ্যতা

পটভূমি : সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধুসভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত মরা মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই)। বাঙালি পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্রযুগের নিদর্শন। একই সময়ে ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানীর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরও বহু নিদর্শন আবিষ্কার করে।

চিত্র-১০ : সিন্ধুসভ্যতার মানচিত্র

ভৌগোলিক অবস্থান : উপমহাদেশের প্রাচীনতম সিন্ধুসভ্যতার বিস্তৃতি বিশাল এলাকাজুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐ সভ্যতা শুধু সিন্ধু অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সিন্ধুসভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

> **একক কাজ :** ভারত ও পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে? অঞ্চলগুলোর আলাদা আলাদা তালিকা প্রস্তুত করো।

সময়কাল : সিন্ধুসভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৫০০ অথবা ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধুসভ্যতার অবসান ঘটে। তবে মর্টিমার হুইলার মনে করেন, এই সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

রাজনৈতিক অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসনপ্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নগর বিন্যাস প্রায় একই রকম ছিল। এগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী উঁচু ভিতের উপর শহরগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরগুলোর এক পাশে উঁচু ভিতের উপর একটি করে নগরদুর্গ নির্মাণ করা হতো। চারদিক থাকত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতেন। প্রশাসনিক বাড়িঘরও দুর্গের মধ্যে ছিল। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার। দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত।

সামাজিক অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল। সিন্ধুসভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ-সুবিধা পেত না। সমাজ ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকরা গ্রামে বসবাস করত। শহরে ধনী এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা-আলাদা বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। সিন্ধুসভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা খুবই শৌখিন ছিল। তাদের প্রিয় অলংকারের মধ্যে ছিল হার, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্ধ, চুড়ি, বালা, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। পুরুষরাও অলংকার ব্যবহার করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তাছাড়াও অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বণিকদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা : সিন্ধুসভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি; যে কারণে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। মন্দির বা উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব না থাকলেও স্থানে স্থানে অসংখ্য পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, তারা ঐ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত। সিন্ধুবাসীর মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা দেব-দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশু-পাখির উপাসনাও করত। সিন্ধুবাসী পরলোকে বিশ্বাস করত। যে কারণে কবরে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলঙ্কার রেখে দিত।

> **একক কাজ :**
> ১। সিন্ধুসভ্যতার নারীদের প্রিয় অলঙ্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
> ২। সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন শিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কী সম্পর্ক?

সিন্ধুসভ্যতার অবদান : পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা। নিম্নে এই সভ্যতার অবদান আলোচনা করা হলো।

নগর পরিকল্পনা : সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্যে ছোট নর্দমাগুলোকে মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

পরিমাপ পদ্ধতি : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ করতে শিখেছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।

শিল্প : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীদের শিল্পবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয়। তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত। পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত। তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল। ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলংকার তৈরি করা হতো। তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। কারিগররা রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করত। তাছাড়া সোনা, রুপা, তামা, ইলেক্ট্রাম ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলংকার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্ধ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জানত না। তারা ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলংকারও তৈরি করতে পারত। হাতির দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দক্ষ কারিগর ছিল।

দলীয় কাজ : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা যে যে শিল্পে পারদর্শী ছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে।

চিত্র-১১ : বৃহৎ স্নানাগার

আবার কোথাও দুই–তিন তলা ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যা ৮০ ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নিদর্শন পাওয়া গেছে যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী।

চিত্র-১২ : সিলমোহর

ভাস্কর্যশিল্পেও সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীদের দক্ষতা ছিল। পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈল্পিক ও কারিগরি দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরে তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে

পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারীমূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল। ধর্মীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো।

কাজ : ছক পূরণ করো–

সিন্ধুসভ্যতার স্থাপত্য	প্রাপ্তিস্থান

মিশরীয় সভ্যতা

পটভূমি : আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত দেশটির নাম ইজিপ্ট বা মিশর। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ অব্দ পর্যন্ত নীল নদের অববাহিকায় একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব হয়, যা মিশরীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে।

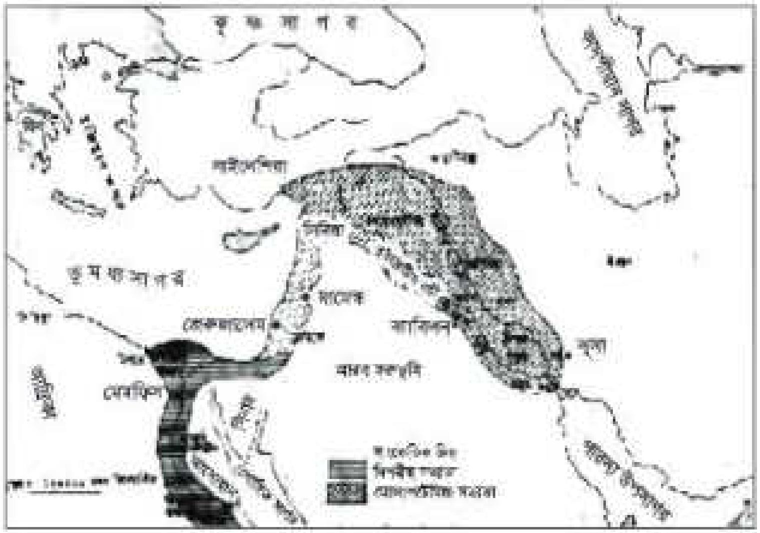

চিত্র-৬ : প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মানচিত্র

৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয়। এ সময় থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। একই সময়ে নারমার বা মেনেস হন একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি ও পুরোহিত। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারাওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান : তিনটি মহাদেশ দ্বারা ঘিরে থাকা মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণে সুদান ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ। এর মোট আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল।

সময়কাল : মিশরীয় সভ্যতা ২৫০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। প্রাচীন মিশরের নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা হয় ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। বিশেষ করে নবোপলীয় যুগে।

তবে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় মেনেসের নেতৃত্বে, যা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকে লিবিয়ার এক যোদ্ধা জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয়। ৬৭০-৬৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অ্যাসিরীয়রা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারস্য মিশর দখল করে নিলে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ: প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতকগুলো ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 'নোম' বলা হতো। মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও (মেনেস বা নারমার) সমগ্র মিশরকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন, যার রাজধানী ছিল দক্ষিণ মিশরের মেম্ফিসে। তখন থেকে মিশরে ঐক্যবদ্ধ রাজ্য ও রাজবংশের উদ্ভব। মিশরীয় 'পের-ও' শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারাওরা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তারা নিজেদের সূর্য দেবতার বংশধর মনে করত। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকারসূত্রে ফারাও।

পেশার ওপর ভিত্তি করে মিশরীয়দের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন– রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কৃষক ও ভূমিদাস শ্রেণি।

মিশরের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচফল ইত্যাদি। ব্যবসা-বাণিজ্যেও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো। বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করত।

নীল নদ: মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন– 'মিশর নীল নদের দান'। নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান: প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি, কাগজের আবিষ্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা– সবকিছুই তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। মিশরীয়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাদের জীবন ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস: সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তিপূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল– সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীল নদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে, তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

একক কাজ: মিশরের উৎপাদিত ফসল ও আমদানিকৃত পণ্যের ছক তৈরি করো।

চিত্র-৭ : মিশরে অবস্থিত প্রাচীন প্রস্তরনির্মিত পিরামিড

মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মমি করে রাখত। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওরা স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করত। তারা ছিল প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতকেও তারা নিয়োগ করত।

শিল্প : মিশরীয়দের চিত্রকলা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের মতো চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। তারা সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে চিত্রশিল্পের সূচনা করে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। সেসব ছবির মধ্যে সমসাময়িক মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনি ফুটে উঠেছে।

চিত্র-৮ : মিশর সভ্যতায় স্ফিংসের প্রতিমূর্তি

কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারু শিল্পের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

একক কাজ : মিশরীয় শিল্পীরা যেসব স্থাপনার দেয়ালে ছবি এঁকেছে, বিষয়বস্তু উল্লেখসহ তার একটি চার্ট তৈরি করো।

ভাস্কর্য : ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের মতো প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংক্স। স্ফিংক্স হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহ সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের মতো। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

লিখনপদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার : মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগরসভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখনপদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি।

এই চিত্রলিপিকে বলা হয় ' হায়ারোগ্লিফিক ' বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের ওপর তারা লিখত। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এই শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি। এখানে উল্লেখ্য, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয় যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক এবং' হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

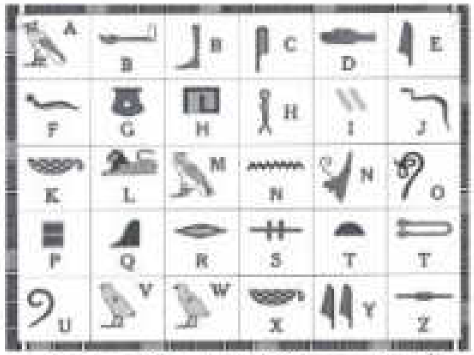

চিত্র-৯ : কার্সিভ হায়ারোগ্লিফিক বা পবিত্র বর্ণ লেখার নমুনা

বিজ্ঞান : মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। সে কারণে নীল নদের প্লাবন, নাব্য, পানিপ্রবাহের মাপ জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ। ফলে এ দুইটি বিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল। তারা অঙ্কশাস্ত্রের দুইটি শাখা জ্যামিতি এবং পাটিগণিতেরও প্রচলন করে। মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। ৪২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তারা প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্যঘড়ি, ছায়াঘড়ি, পানিঘড়ি আবিষ্কার করে।

ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত এবং ফারাওরা পরবর্তী জন্মেও রাজা হবেন এই বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই তারা ফারাওদের দেহ তাজা রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এ কারণেই মমি তৈরি শুরু হয়। মিশরীয় বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল। তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত।

মিশরীয়রা দর্শন ও সাহিত্যচর্চা করত। তাদের রচনায় দুঃখ-হতাশার কোনো প্রকাশ ছিল না। তারা আশাবাদী ছিল। তাদের লেখায় সব সময়ই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে।

একক কাজ : মিশরীয় কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অঙ্কশাস্ত্রের কী সম্পর্ক?

চৈনিক সভ্যতা

ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে চীন দেশটির পাঁচ ভাগের প্রায় চার ভাগই জুড়ে আছে বিস্তৃত পাহাড়, পর্বত এবং মালভূমিতে। প্রাচীন চীন সভ্যতা মূলত দুটি বিশেষ রাজবংশীয় শাসনামলের অর্জন। 'শাং' এবং 'চৌ' যুগের কিছু অর্জনকে আলাদাভাবে তুলে ধরতে পারলেই একঅর্থে প্রাচীন সম্পর্কে আপাত কিছু ধারণা অর্জন করা যেতে পারে। তবে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সঙ্গে টিকে থাকার মূল কারণ একাধারে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক।

বস্তুত চীন ভৌগোলিকভাবে অন্য যেকোনো দেশের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এলাকা হলেও নানা দিক থেকে তারা ছিল বেশ সমৃদ্ধ। ফলে খাবার ও বাসস্থান সংকটে চীনাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দিতে হয়নি। ভৌগোলিক অবস্থানগতভাবে চীনের সঙ্গে যুক্ত ছিল পার্শ্ববর্তী তিব্বত, সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া। বিবর্তনবাদী ইতিহাস গবেষকরা পিকিংম্যান (Sinanthropus Pekinesis) দের দেহাবশেষ প্রাপ্তিকাল থেকে চৈনিক ইতিহাস ও সভ্যতার আলোচনা শুরু করেন।

প্রাচীন চীনে তিনটি অঞ্চল ঘিরে সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল যার কেন্দ্র ছিল পশ্চিমের উচ্চভূমি হতে উৎপন্ন নদীসমূহ। প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে হোয়াং হো তীরবর্তী অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি ইয়াংজেকিয়াং তীরবর্তী অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে।

হোয়াংহো নদীর ধীর প্রবাহ এর দুতীরে বিস্তীর্ণ পলল ভূমির সৃষ্টি করেছে। তবে বর্ষায় দু-কূল ছাপিয়ে আসা বন্যায় জীবন ও ফসল অনেক সময় ধ্বংস হতো। আর এজন্যই ইতিহাসে হোয়াংহো পরিচয় তৈরি করেছে 'চীনের দুঃখ'। চীনের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ইয়াংজেকিয়াং বিশ্বের অন্যতম বড় নদী। দক্ষিণ চীনের পাহাড়ি অঞ্চল ছিল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। দক্ষিণে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠায় তা বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

অন্য সব সভ্যতা থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন বলে চীনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকেও সহজে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়।

সভ্যতার অর্জন ও অবদান

'ইয়াং' এবং 'ইন' নামের দুটো শক্তিকে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা এক বৃত্তের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের পরিচয় হিসেবে দেখে চীনা দর্শন। বৃত্তের এক অংশ ছিল সাদা আর অন্যটি কালো। ঔজ্জ্বল্য, উষ্ণতা, কর্মক্ষমতাকে চীনারা 'ইয়াং' শীর্ষক পুরুষসত্তা আর ঠিক তার বিপরীতে অন্ধকার, নীরবতা, শীতলতা ও কোমলতার প্রতীক হিসেবে 'ইন' নামের নারীসত্তাকে কল্পনায় ঠাঁই দিয়েছিল। ওদিকে তাদের হিসেবে এই 'ইয়াং' এবং 'ইন' এর মিলনে জন্ম নিয়েছিল 'পানকু' নামের পৌরাণিক মানব। তাদের হিসেবে এই পানকুই রূপ নিয়েছিল প্রাচীন পৃথিবীতে।

চীনা বিশ্বাসে পানকুর তিনজন সহকারী ছিল টার্টল তথা কাছিম, কুইলিন, 'ড্রাগন' ও 'ফিনিক্স'। পৌরাণিক যুগের শাসক হিসেবে চার হাজার বছর পূর্বে চীনের বিভিন্ন জাতি মিলে নির্বাচিত হুয়াং তি (Huang Ti/ Huangdi) এর নাম বলা যায়। তিনি হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ওদিকে হলদে সম্রাট (The Yellow Emperor/Yellow Thearch) নামে পরিচিত হুয়াং তির সময় চীনের লোকেরা গুটিপোকার চাষ, নৌকা ও মালটানা গাড়ি তৈরির পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। তাদের লিখনপদ্ধতির সূচনাও হয়েছিল তখন। 'ইয়াও', 'সুন', এবং 'উ' এরপর তাদের রাজা হয়েছিলেন।

চীনের রাজারা হোয়াংহো নদীর ভয়াবহ প্লাবনের সময় বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। এমনকি তারা, লিখনপদ্ধতি, মাছ ধরা, সংগীত, চিত্রকলা, পশুপালন এবং রেশম চাষ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। ওদিকে কৃষি, বাণিজ্য ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কেও তাদের উপযুক্ত ধারণা ছিল দীর্ঘদিন। এছাড়া চৈনিক ইতিহাসের সূত্র হিসেবে হাড়ের উপর লিখিত লিপি পাওয়া যায়।

চীনের হোয়াংহো নদীতে প্রচুর বন্যা হতো। এই বন্যা চীনাদের পাঁচবার রাজধানী স্থানান্তরে বাধ্য করেছিল। অনেকটা আদিম ধরনের কৃষিপদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করলেও চৈনিক অর্থনীতির মূলভিত্তিই ছিল কৃষি। গম ও যব প্রধান উৎপাদিত শস্য হলেও কিছু পরিমাণ ধান তারা চাষ করতো। তারা শিকার ও পশুপালনের মাধ্যমে মাংস চাহিদা পূরণ করত। তখনকার সাধারণ মানুষ পশু হিসেবে কুকুর, শূকর, ছাগল, ভেড়া, ষাঁড়, ঘোড়া, হাঁস মুরগি, মহিষ, বানর এবং হাতিও পালন করত। শূকরের মাংসের মতো তাদের খাদ্য-তালিকায় কুকুরের মাংসও

বেশ জনপ্রিয় ছিল। কৃষি ও পশুপালনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় শাং জনগোষ্ঠী যাযাবর ছিল না। তারা মাটির ঘর কিংবা গর্তে বাস করত।

যতটুকু জানা গিয়েছে চৈনিক রাজা একাধারে সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণ, বেসামরিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিত। পুরোহিতরা তখন ধর্মীয় দায়িত্ব ছাড়াও জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা করত। তারা ক্যালেন্ডার তৈরিতেও ভূমিকা রাখত। পুরোহিতরা অঙ্ক ও গণিতশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। চৌদ্দ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শুরুতে চীনারা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় নির্ধারণ করতে পেরেছিল যা ছিল যুগান্তকারী।

গ্রিকসভ্যতা

পটভূমি : ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় উন্নত এক প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশ নগরীর ধ্বংসস্তূপের। যাকে বলা হয় ইজিয়ান সভ্যতা বা প্রাক-ক্লাসিক্যাল গ্রিকসভ্যতা।

ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং ইজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে এই সভ্যতা। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সভ্যতাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. **মিনিয়ান সভ্যতা :** ক্রিট দ্বীপে যে সভ্যতার উদ্ভব এর স্থায়িত্ব ধরা হয়েছে ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

২. **দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাইসিনীয় বা ইজিয়ান সভ্যতা :** গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল ১৬০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। ধারণা করা হয় বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অবসান ঘটে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল : গ্রিস দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রিকসভ্যতার সঙ্গে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িত। একটি 'হেলেনিক' অপরটি 'হেলেনিস্টিক'। গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'হেলেনিক সংস্কৃতি'। অপরদিকে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অ-গ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতির। ইতিহাসে এ সংস্কৃতি 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' নামে পরিচিত।

সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা : প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার একটি ছিল স্পার্টা। এ নগররাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস নামক অঞ্চলে। অন্যান্য নগররাষ্ট্র থেকে স্পার্টা ছিল আলাদা। স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিল। মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দীর্ঘ যুদ্ধের পর ডোরিয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। এই পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিদাস বা হেলট বলা হতো। এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত।

পরাজিত অধিবাসী যারা ভূমিদাস হতে বাধ্য হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ফলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না।

স্পার্টানদের জীবন স্পার্টা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত ছিল। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মুল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর।

গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স : প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে। তবে প্রথম দিকে এথেন্সে ছিল রাজতন্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা চলে আসে অভিজাতদের হাতে। দেশ শাসনের নামে তারা শুধু নিজের স্বার্থই দেখত। ফলে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যদিও তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাদের নামে কিছু লোক ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয়। তাদের বলা হতো 'টাইরান্ট'। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ এবং বঞ্চিত কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পরিবর্তন আসে। আগে অভিজাত পরিবারের সন্তান অভিজাত বলে গণ্য হতো। এখন অর্থের মানদণ্ডে অভিজাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

দেশে মারাত্মক সংকটের সময়ে সব শ্রেণি সর্বসম্মতভাবে কয়েকজনকে সংস্কারের জন্য আহ্বান জানায়। তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন অভিজাত বংশে জন্ম নেওয়া 'সোলন'। তিনি কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেন এবং গ্রিক আইনের কঠোরতা হ্রাস করেন। তিনি ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আইন পাস করেন। তাঁর সময় অনেক অর্থনৈতিক সংস্কারও করা হয়।

চিত্র-১৩ : পেরিক্লিস

সোলনের পর জনগণের কল্যাণে তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিসট্রেটাস এবং ক্লিসথেনিস। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য অনেক আইন পাস করেন। তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় পেরিক্লিসের সময়। তার সময়কে গ্রিকসভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় এসে তিনি ৩০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি মেনে নেন।

তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জুরি বিচারের দায়িত্ব পালন করত।

পেরিক্লিসের যুগে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের ভয়াবহ মহামারিতে এক-চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। এই মহামারিতে পেরিক্লিসেরও মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর পরই এথেন্সের দুর্ভোগ শুরু হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখা নগররাষ্ট্র এথেন্সের পতন হয় সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার কাছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা ইতিহাসে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৪৬০ থেকে ৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মোট তিনবার এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দুই রাষ্ট্র পরস্পরের মিত্রদের নিয়ে জোট গঠন করে। এথেন্সের মিত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জোটের নাম ছিল 'ডেলিয়ান লীগ'। অপরদিকে স্পার্টা তার মিত্রদের নিয়ে যে জোট গঠন করে, তার নাম ছিল 'পেলোপনেসীয় লীগ'। এই মরণপণ যুদ্ধে এথেন্সের মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিলীন হয়ে যায়। ৩৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

২০২৫

এথেন্স চলে যায় স্পার্টার অধীনে। এরপর নগররাষ্ট্র থিবৃস্ অধিকার করে নেয় এথেন্স। ৩৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেসিডোনের (গ্রিস) রাজা ফিলিপ থিবাস দখল করে নিলে এথেন্স মেসিডোনের অধীনে চলে যায়।

> **দলীয় কাজ :** জনগণের কল্যাণের জন্য এথেন্সের যেসব মনীষী বিভিন্ন সংস্কার ও আইন পাস করেন, তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করো।

সভ্যতায় গ্রিসের অবদান : ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, খেলাধুলা– সবকিছু এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল অবদান ছিল এথেন্সের। আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি।

শিক্ষা : শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করতেন সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত। সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া। স্বাধীন গ্রিসবাসীর ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করত। ধনী ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। দাসদের সন্তানের জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরাও কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারত না।

দলীয় কাজ

ছক পূরণ করো

এথেন্সের নাগরিকদের কল্যাণে কে কী করেন–	
সোলন	
পেরিক্লিস	

সাহিত্য : সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য তার অপূর্ব নিদর্শন। সাহিত্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্ত নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। এসকাইলাসকে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড'। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন।

ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। হেরোডটাস ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত ছিলেন। হেরোডটাস রচিত ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে। থুকিডাইডেস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দা পেলোপনেসিয়ান ওয়র'।

ধর্ম : গ্রিকদের বারোটি দেব-দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীরযোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা।

এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বারোজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

দর্শন : দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে–এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বলা হতো সফিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাঁদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

চিত্র-১৪ : সক্রেটিস

বিজ্ঞান : গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন গ্রিক বিজ্ঞানীরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে– এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : গ্রিক শিল্পের বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্রশিল্পের নিদর্শন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। আর প্রাসাদের স্তম্ভগুলো থাকত অপূর্ব কারুকার্যখচিত। পার্থেনন মন্দির বা দেবী এথেনার মন্দির স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে।

গ্রিক ভাস্কর্য পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস।

খেলাধুলা : শিশুদের খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো। বিদ্যালয়ে তাদের খেলাধুলার হাতেখড়ি হতো। শরীরচর্চা খেলাধুলার প্রতি গ্রিকদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিত। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। প্রতি চার বছর পরপর এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে।

একক কাজ : গ্রিকসভ্যতার বিখ্যাত মনীষীর নামের তালিকা প্রস্তুত করো।

রোমান সভ্যতা

পটভূমি : গ্রিক সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রথম দিকে রোম একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। এ সময় একটি সভা ও সিনেট ছিল। রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ৫১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়'শ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল : ইতালির মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগর অবস্থিত। ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিকে আল্পস্ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালি ও এককালের যুগোস্লাভিয়ার মাঝখানে আড্রিয়াটিক সাগর। আড্রিয়াটিক সাগর তীরে ইতালির উত্তর-পূর্ব অংশে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া। ইতালির পশ্চিমাংশেও ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। সাগরের এ অংশকে প্রাচীনকালে বলা হতো এট্রুস্কান সাগর। কৃষি বিকাশের সুযোগ ছিল বলে প্রাচীন রোম ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। ফলে রোমের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ সাধারণ বিষয় ছিল। যে কারণে এসব সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রোমানরা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হতে থাকে। রোমান ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান যোদ্ধা জাতিগুলোর হাতে রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

রোম নগরী ও রোমান শাসনের পরিচয় : গুরুত্বপূর্ণ টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে সাতটি পর্বতশ্রেণির ওপর রোম অবস্থিত। এজন্য একে সাতটি পর্বতের নগরীও বলা হয়। ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একদল মানুষ ইতালিতে বসবাস শুরু করে। তাদেরকেই লাতিন বলা হতো। তাঁদের নাম অনুসারে ভাষার নামও হয় লাতিন ভাষা। লাতিন রাজা রোমিউলাস রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী নগরের নাম হয় রোম।

রোমের গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধাপে ধাপে নানা সংস্কার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিকরা রোমান ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ৭৫৩-৫১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগে সাতজন সম্রাট দেশ শাসন করেন। এ যুগের সর্বশেষ সম্রাট টারকিউনিয়াস সুপারকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর রোমে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলে ৫০০ থেকে ৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। রোমে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ বিদ্রোহী নেতা ব্রুটাস এবং অপর এক ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে শাসনের সুযোগ প্রদান করে। রাজতন্ত্রের পতনের পর রোমের

জনগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্যাট্রিসিয়ান অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণি, আর প্লিবিয়ান যারা সাধারণ নাগরিক। ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর, বণিকরা প্লিবিয়ান শ্রেণিভুক্ত।

একক কাজ
রোমান সভ্যতার বর্ণনা করতে যেসব নদী-সাগর-পাহাড়ের উল্লেখ আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

প্রজাতন্ত্রের প্রথম ২০০ বছর ছিল প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস। সমাজে প্লিবিয়ানরা বঞ্চিত শ্রেণি ছিল। অধিকারবঞ্চিত প্লিবিয়ানরা ক্রমাগত সংগ্রাম করতে থাকে। প্লিবিয়ানদের দাবির মুখে রোমান আইন সংকলিত হতে থাকে। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্লিবিয়ানরা ব্রোঞ্জপাতে ১২টি আইন লিখিতভাবে প্রণয়ন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে দুজন কনসালের মধ্যে একজন প্লিবিয়ানদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে রোমান প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়।

রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমে দেশটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে রোম সমগ্র ইতালির ওপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। ১৪৬ থেকে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমান সভ্যতার অন্ধকার যুগ। ধনী-দরিদ্র সংঘাত, দাস বিদ্রোহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও সহিংসতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে রোম।

রোমের অর্থনীতি ছিল দাসদের ওপর নির্ভরশীল। শাসকদের অমানুষিক নির্যাতনে দাসরা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুই বছরব্যাপী তারা তাদের বিদ্রোহ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ৭১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাস নিহত হলে বিদ্রোহের অবসান হয়। চরম নির্যাতন নেমে আসে দাসদের ওপর।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছাড়াও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে রোম। ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতারা ক্ষমতায় আসতে থাকেন এবং রোমে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে তিনজন নেতা একযোগে ক্ষমতায় আসেন, যা ইতিহাসে ত্রয়ী শাসন নামে পরিচিত। বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে তিন ভাগ করে শাসনের দায়িত্ব নেন অক্টোভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাস। লেপিডাসের দায়িত্বে ছিল আফ্রিকার প্রদেশসমূহ, অক্টোভিয়াস সিজারের দায়িত্বে ছিল ইতালিসহ সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ, এন্টনির দায়িত্বে ছিল পূর্বাঞ্চল। তবে তিনজনের শাসন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল রোমের একচ্ছত্র অধিপতি বা সম্রাট হওয়ার। ফলে খুব শীঘ্রই আবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। অক্টোভিয়াস সিজার পরাজিত করে লেপিডাসকে, এদিকে মার্ক এন্টনি মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন। কিন্তু অক্টোভিয়াস সিজারের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হন। ক্ষমতা দখল করে অক্টোভিয়াস সিজার অগাস্টাস সিজার নাম ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি এই নামেই বেশি পরিচিত। ১৪ খ্রিষ্টাব্দে অগাস্টাস সিজারের মৃত্যু হয়। তাঁর সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যিশুখ্রিষ্টের জন্ম। অগাস্টাস সিজারের মৃত্যুর পর রোমে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিদেশি আক্রমণ, বিশেষ করে জার্মান বর্বর গোত্রগুলোর আক্রমণ তীব্র হতে থাকে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কোন্দলের কারণে রোমানদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। রোমের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাস জার্মান বর্বর গোত্রের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ইতোমধ্যে খ্রিষ্টধর্মের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং জার্মানদের উত্থান ঘটে।

সভ্যতায় রোমের অবদান : রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা এসব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে ব্যাপক ঋণী।

শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতি : এ সময়ে শিক্ষা বলতে বোঝাতো খেলাধুলা ও বীরদের স্মৃতিকথা বর্ণনা করা। যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে রোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সুতরাং তাদের সবকিছুই ছিল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তারপরও উচ্চ শ্রেণিভুক্ত রোমানদের গ্রিক ভাষা শিক্ষা ছিল একটি ফ্যাশন। ফলে এদের অনেকেই গ্রিক সাহিত্যকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করার দক্ষতা অর্জন করে। রোমের অভিজাত যুবকরা গ্রিসের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত।

দলীয় কাজ : রোমের ত্রয়ী শাসন আমলে কে কোন অঞ্চলের শাসক ছিলেন তা ছকে উল্লেখ করো।

শাসকের নাম	শাসিত অঞ্চলসমূহ
১।	
২।	
৩।	

সে যুগে সাহিত্যে অবদানের জন্য প্লুটাস ও টেরেন্সর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা দুজন মিলনাত্মক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি দেখা যায় অগাস্টাস সিজারের সময়। এ যুগের কবি হোরাস ও ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ওভিদ ও লিভি এ যুগের খ্যাতনামা কবি। লিভি ইতিহাসবিদ হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসও এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান : রোমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশালতা। সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন রোমানদের স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। ৮০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টিটাস কর্তৃক নির্মিত কলোসিয়াম নাট্যশালা নির্মিত হয়, যেখানে একসঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত। স্থাপত্যকলার পাশাপাশি রোমান ভাস্কর্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। রোমান ভাস্করগণ দেব-দেবী, সম্রাট, দৈত্য, পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি তৈরি করতেন মার্বেল পাথরের।

চিত্র-১৫ : কলোসিয়াম

বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে প্লিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। এতে প্রায় পাঁচ'শ বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম স্থান পেয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান ছিল। বিজ্ঞানী সেলসাস চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর বই লেখেন। এছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্যালেন রুফাসে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

ধর্ম, দর্শন ও আইন : রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে। রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মার্স, ভলকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমান দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন। কারণ খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন।

অনেকে মনে করেন যে, রোমীয় দর্শন গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তবুও রোমান দর্শনে সিসেরো, লুক্রেটিয়াস (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৯৮-৫৫) তাঁদের সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোমে স্টোইকবাদী দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। ১৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ রোডস দ্বীপের প্যানেটিয়াস এই মতবাদ রোমে প্রথম প্রচার করেন।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। ৫৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

১. **বেসামরিক আইন :** এই আইন পালন করা রোমান নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এই আইন লিখিত অলিখিত দুই রকম ছিল।
২. **জনগণের আইন :** এ আইন সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টি এই আইনে ছিল। তবে এর মাধ্যমে দাসপ্রথাও স্বীকৃতি লাভ করে। সিসেরো এ আইনের প্রণেতা।
৩. **প্রাকৃতিক আইন :** এ আইনে মূলত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের ওপর নির্ভরশীল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন।

মায়া সভ্যতা

আমেরিকার তিনটি সভ্যতা হচ্ছে যথাক্রমে মায়া, আজটেক ও ইনকা। গুয়েতেমালা ও মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল মায়া সভ্যতা। প্রাচীনলিপি থেকে জানা গিয়েছে, মায়া অঞ্চলের লোকেরা ভাবের আদান-প্রদান করার জন্যে একটি ভাষার ব্যবহার করত। তাদের এই ভাষার লিখিত রূপটি ছবি বা চিহ্ন ব্যবহার করায় অনেকটা হায়ারোগ্লিফিক ধাঁচের ছিল। প্রায় ৮০০টির বেশি ছবি ব্যবহার করে তারা এই লিপির প্রচলন ঘটিয়েছিল। মায়ানদের এই লেখা থেকে তাদের সভ্যতা সম্পর্কে জানা যায়। তারা গাছের বাকল দিয়ে তৈরি করা কাগজ থেকে বানাতো কোডেক্স নামের বই।

অর্জন

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে মায়া অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ, মাটির পাত্র নির্মাণ প্রভৃতি আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। তারপর সংস্কৃতির ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তারা সভ্যতায় পদার্পণ করেছিল। মায়া সভ্যতার ইতিহাসকে দুটো অংশে বিভক্ত করা হয়েছে- ক. প্রথম স্তর (৩১৭-৯৮৭ খ্রি.) খ. শেষ স্তর (৯৮৭-১৬৯৭ খ্রি.)।

বেলিজের কিউয়েল্লোতে সম্প্রতি মায়া সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সেখানকার নমুনার রেডিও কার্বন পরীক্ষা করে কালমিতিক সময় পাওয়া গিয়েছে। সেই সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২৬০০ বছর আগের। তখনই তারা বিস্ময়কর স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণ করেছিল। পাশাপাশি মায়া সভ্যতায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ বর্ষপঞ্জিকা।

কৃষি

ধারণা করা হয় প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মায়া অঞ্চলের মানুষ চাষাবাদ করা শুরু করেছিল। প্রথম দিকে তাদের কৃষিনির্ভর গ্রামে সংস্কৃতির উৎপত্তি ঘটেছিল। আনুমানিক ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রথম মায়া জনবসতি প্রতিষ্ঠা পায় প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী সোকোনুস্কো অঞ্চলে। তারা মৃৎপাত্র তৈরি, কৃষিকাজ ও পোড়ানো কাদামাটির মূর্তি বানানোর মতো দক্ষতা অর্জন করেছিল।

অনেক গবেষক ধারণা করেছেন বর্তমান গুয়াতেমালার অন্তর্গত পিতেন অঞ্চলের নিম্নভূমিতে ৩১৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মায়া সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল। গভীর বনভূমি পরিষ্কার করে স্থানীয়রা বসতি স্থাপন করেছিল। তারা কঠোর পরিশ্রম করে জমিকে কৃষিযোগ্য করে তুলেছিল। ফলাফল হিসেবে মায়া অঞ্চলের কৃষকরা শিম, ভুট্টা, টমাটো, লাউ, মিষ্টি আলু, কাসাভা প্রভৃতির চাষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তারপর টিকল, কোপান, পালে প্রভৃতি শহরকে কেন্দ্র করে রহস্যময় মায়া সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। তখন গুয়াতেমালাতেই মায়া সভ্যতার কেন্দ্রগুলো অবস্থিত ছিল। অন্যদিকে পালে শহরটির অবস্থান ছিল মেক্সিকো অঞ্চলে।

মায়া সভ্যতার বেশির ভাগ তথ্য লেখা হয়েছিল সোনার পাতে। মূল্যবান ধাতু সোনার পাতে লেখা এই লিপিগুলো ইউরোপীয়রা তাদের আগ্রাসনের সময় লুট করে। তারা পাতগুলো গলিয়ে সোনা ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে ঐ সময় মায়াদের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

> **দলগত কাজ :** মায়াসভ্যতার সংস্কৃতি ও কৃষির মূল অর্জনগুলোর ছবিগুলো খুঁজে বের করে সে সম্পর্কে তোমাদের মূল্যায়ন লেখো।

ইনকা সভ্যতা

লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর সুউচ্চ সবুজ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে উরুবামবা নদী। এই পাহাড়ি এলাকাতেই প্রাচীন ইনকাদের শহর। এখানেই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লাতিন আমেরিকায় ইনকাদের হারানো শহর মাচুপিচু। ১৯১১ সালে মার্কিন ঐতিহাসিক হিরাম বিংহ্যাম এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

তিনি শুরুতে মাচুপিচুকে ভিলকা বাম্বা বলে মনে করেন। তবে অচিরেই বোঝা যায় তার আবিষ্কৃত এলাকা মাচুপিচুই, এটা ভিলকা বাম্বা নয়। কারণ ফ্রান্সিসকো পিজারোর নেতৃত্বাধীন স্প্যানিশ ডাকাতদল লুণ্ঠনের পাশাপাশি পুরো ভিলকা বাম্বাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তারপর প্রতিষ্ঠা করেছিল নতুন শহর লিমা।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে অবস্থিত ইনকা শহর মাচুপিচুর নির্মাণ শেষ হয় ১৪৫০ সালে। ধারণা করা হয় ইনকা সম্রাট পাচাকুটির নির্দেশে হয়েছিল এই নির্মাণ। তবে শত বছর না পেরোতেই পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল শহরটি। কেউ কেউ দাবি করেন- ইউরোপীয়দের আগ্রাসনের সময় মহামারির কবলে পড়েছিল মাচুপিচু। ভয়াবহ মহামারির ফলে বেশির ভাগ মানুষ মারা গেলে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল ইনকা নগরী মাচুপিচু। অনেক ইতিহাসবিদ দাবি করেছেন মহামারির কবলে পড়ে মাচুপিচু ধ্বংস হয়নি। স্প্যানিশ আগ্রাসনকারীরা সেই ইনকা শহর দখল করতে গিয়ে সেখানকার বেশির ভাগ অধিবাসীকে মেরে ফেলেছিল।

স্প্যানিয়ার্ড দস্যুনেতা ফ্রান্সিসকো পিজারো ১৫৩২ সালে ইনকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তখন ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপার রাজধানী ছিল কুজকো শহরে। বর্তমান পেরুতে এর অবস্থান। ইনকারা তাদের সাম্রাজ্য ততদিনে উত্তরে ইকুয়েডর থেকে দক্ষিণে চিলির মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরো আন্দিজ পর্বতমালা জুড়ে বিস্তার ঘটাতে পেরেছে।

ইনকাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যায়– তারা আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে কুজকো উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। কাপাক প্রথম ইনকা সম্রাট হলেও নবম ইনকা সম্রাট পাচাকুটি ১৪৩৮ সালের দিকে ইনকা সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু করেন। তার সক্ষমতা আর যুদ্ধবাজ নীতি ইনকাদের উত্তর-দক্ষিণে ২,৭০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তারের পথ করে দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ইনকা শাসক ছিলেন মানকো কাপাক, মায়তা কাপাক, ইয়াহুয়ার হুয়াকাক, পাচাকুটি ইনকা, টোপা ইনকা এবং হুয়ায়না কাপাক।

মানকো কাপাককে ইনকাদের প্রথম সম্রাট দাবি করা হলেও তাকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের সন্দেহ রয়েছে। ধারাবাহিক শাসনের শেষদিকে আতাহুয়ালপার শাসনামলেই স্প্যানিয়ার্ড ডাকাতদল আক্রমণ করেছিল ইনকাদের শহর। তারা লুটপাট ও তছনছ করেছিল ইনকাদের সুসজ্জিত নগর ও সমৃদ্ধ সভ্যতা।

খাদ্য ও কৃষি

তারা গিনিপিগ ও লামার মাংসের পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছ ধরতে পারলে সিদ্ধ করে কিংবা পুড়িয়ে খেত। পশ্চিমে প্রশান্ত সাগর আর সেই জগদ্বিখ্যাত টিটিকাকা হ্রদের মাছ ছিল তাদের খুব প্রিয়। পাশাপাশি, ভুট্টা পিষে চিচা নামের তিতকুটে একধরনের পানীয় তৈরি করত ইনকারা।

সিংহভাগ ক্ষেত্রে নিরামিষভোজী হওয়ায় গোল আলু ছিল ইনকাদের প্রধান খাদ্যশস্য। তারা ভুট্টা, নানা ধরনের শিম, মিষ্টি আলু, টমেটো, লাউ, কাঁচা মরিচ ইত্যাদির চাষ করতো। একমাত্র লাউ ছাড়া অন্য সব তরিতরকারি এবং খাদ্যশস্য ইউরোপ, আফ্রিকা বা এশিয়ায় প্রায় অপরিচিত। পাহাড়ীদের প্রধান খাবার ছিল আলু। মাঝারি উচ্চতার ভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল ভুট্টা।

তৎকালীন ইনকা তথা পেরুতে চার প্রজাতির উট জাতীয় প্রাণী ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে লামা, আলপাকা, ভিকুনা এবং গুয়ানাকো। প্রথম দুটি প্রাণী আকারে বেশ বড় হলেও ভিকুনা আর গুয়ানোকো ছিল বেশ ছোট, অনেকটা ছাগলের মতো। তবে লামা কিংবা আলপাকাও উটের তুলনায় একেবারে ছোট।

তারা লামাকে গাধার মতো ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি আলপাকাকে পোষ মানাত লোমের জন্য। আলপাকার গাঢ় বাদামি বা কালো রঙের লোম দিয়ে তারা গরম কাপড় তৈরি করত। লামা ও আলপাকার পাশাপাশি কুকুর, গিনিপিগ এবং হাঁস পুষতো তারা।

ইনকারা গিনিপিগের মাংস খেত। পাহাড়ি পথে চলাচলের ক্ষেত্রে পায়ের সুরক্ষায় জুতা ও স্যান্ডেল পরত। ইনকা নারীরা লম্বা একখণ্ড কাপড় দিয়ে তৈরি বিশেষ পোশাক পরতেন। কাপড়টি কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পুরো শরীরকে ঢেকে রাখতো।

ধর্ম ও অন্যান্য অর্জন

নারীরা লম্বা চুল রেখে মাথার মাঝখানে সিঁথি করত। পুরুষরা চুল কাটতো সামনের দিকে ছোট করে। তবে পেছনের দিকে বেশ লম্বা ছিল। সব শ্রেণির ইনকা নারী গলায় হার পরার পাশাপাশি শুধু অভিজাত ইনকা পুরুষরা কানে বিশেষ গয়না পরত।

ধারণা করা হয়, ইনকাদের রাজ্যে সব শহরে সূর্যদেবের মন্দির ছিল। মন্দিরের ভেতরে পূজা না হয়ে হতো বাইরের চত্বরে। পুরোহিতরাই মন্দিরে প্রবেশ করে সেখান থেকে পূজার উপকরণ নিয়ে এসে খোলা চত্বরে পূজা অনুষ্ঠান করতো।

ইনকা রাজ্যের সবচেয়ে বড় সূর্যমন্দির ছিল কুজকো শহরে। সব মন্দিরেই অনেকগুলো দালান থাকতো পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীদের থাকার জন্য। মন্দির সংলগ্ন আলাদা বাড়িতে সন্ন্যাসিনী বা পবিত্র নারীরা বাস করতেন। সূর্য কুমারী বা মামাকুনা নামের চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী এবং নির্বাচিত নারী তথা আক্লাকুনারাই এখানে থাকতেন।

দলীয় কাজ : ইনকাদের বিখ্যাত স্থানগুলোর নামের তালিকা করো এবং কী কারণে বিখ্যাত লেখ।

আজটেক সভ্যতা

স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা ১৫১৯ সালের দিকে মধ্য মেক্সিকোতে আজটেক সভ্যতার এক সমৃদ্ধ নগরের সন্ধান পায়। তারা সমৃদ্ধ এই নগর থেকে বিভিন্ন সম্পদ লুটপাট করে। তাদের আক্রমণের অনেক আগে মেক্সিকো অঞ্চলের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি থেকে আজটেক জাতির নাম শোনা যায়। তারা প্রথম বসতি গড়েছিল আজলটান অঞ্চলে। জায়গাটি ছিল মেক্সিকোর উত্তরে কিংবা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোথাও। সভ্যতা বিকাশের গোড়ার দিকে আজটেকরা ছিল যাযাবর। তাদের জনসংখ্যা তেমন একটা বেশি ছিল না।

স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা ১৫১৯ সালের দিকে মধ্য মেক্সিকোতে আজটেক সভ্যতার এক সমৃদ্ধ নগরের সন্ধান পায়। তারা সমৃদ্ধ এই নগর থেকে বিভিন্ন সম্পদ লুটপাট করে। তাদের আক্রমণের অনেক আগে মেক্সিকো অঞ্চলের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি থেকে আজটেক জাতির নাম শোনা যায়। তারা প্রথম বসতি গড়েছিল আজলটান অঞ্চলে। জায়গাটি ছিল মেক্সিকোর উত্তরে কিংবা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোথাও। সভ্যতা বিকাশের গোড়ার দিকে আজটেকরা ছিল যাযাবর। তাদের জনসংখ্যা তেমন একটা বেশি ছিল না।

খ্রিষ্টীয় নবম শতকে গুয়েতেমালার পাশাপাশি ইউকাতান অঞ্চলে যখন মায়া সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিলো, তখন মধ্য-মেক্সিকো অঞ্চলের তেইদিহুয়াকান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আরেক সমৃদ্ধ সভ্যতা। সাম্প্রতিক সময়ের 'মেক্সিকো সিটি' ঠিক যেখানে তার থেকে মাইল পঁচিশেক উত্তর-পশ্চিমে এই তেইদিহুয়াকান নগরটির অবস্থান। অন্যদিকে মধ্য-মেক্সিকোতে টোলটেক জাতি বিকাশ ঘটিয়েছিল এক নতুন সভ্যতার। তারা সেখানে তৈরি করে বড় বড় শহর। তাদের রাজধানী ছিল টোলান নগরী যা বর্তমানে টুলা নামে পরিচিত।

মেক্সিকো সিটি নগরী থেকে ষাট মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে টোলান নগরীটির অবস্থান যেখানে নির্মাণ করা হয় বড় দালান-কোঠা, মন্দির ও পিরামিড। তারা মায়াদের অনুকরণে লেখার কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং পঞ্জিকাও তৈরি করতে পারতো।

নগর

বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় আজটেকরা গড়ে তোলে সমৃদ্ধ নগর ও স্থাপত্য। ১০০০ সালের দিকে নহুয়া ভাষায় কথা বলা কয়েকটি জাতির আক্রমণে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। ওখানকার কুলহুয়া জাতির শহর কুলহুয়াকান গড়ে ওঠে টেক্সকোকো হ্রদের দক্ষিণ তীরে। তখন এই হ্রদের পূর্ব তীরে টেক্সকোকো নামে আরেকটি সমৃদ্ধ নগর গড়ে উঠেছিল। তারাও নহুয়া ভাষায় কথা বলত।

কুলহুয়া জাতির মানুষ মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলে আজটেক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বলে অনেকের ধারণা। শুরুতে ১০০০ সালের অল্পসময় পরেই ধীরে কুলহুয়া, টেক্সকোকো, টেপানেকসহ অন্যান্য স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী মধ্য মেক্সিকো উপত্যকায় মূলত অভিন্ন ধাঁচের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। তাদের গড়ে তোলা এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরে নাম দেয়া হয়েছে আজটেক সভ্যতা।

তেরো শতকে টেনোচকা নামে আরেকটি নহুয়া ভাষায় কথা বলা জাতিগোষ্ঠী এসে বসতি স্থাপন করেছিল আজটেকদের এলাকায়। তারাও টেক্সকোকো হ্রদের মাঝখানে একটা দ্বীপে বাস করত। ১৩২৫ সালে তারা তেনোচ্‌তিত্‌লান নামে একটা শহরের পত্তন করে। পরে এই টেনোচকাদেরকে আজটেক নামে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ওদের রাজধানী ছিলো তেনোচ্‌তিত্‌লান। আর ঠিক তার ধ্বংসাবশেষের উপরে গড়ে উঠেছে বর্তমান মেক্সিকোর রাজধানী শহর 'মেক্সিকো সিটি'। আর সেদিক থেকে ধরতে গেলে টেনোচকাদের থেকে আজটেক জাতিগোষ্ঠীর বিকাশ। আর একইভাবে তেনোচ্‌তিত্‌লানের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে 'মেক্সিকো সিটি'।

২০২৫

উপনিবেশ বিস্তারের সময়ে ১৫১৯ সালের দিকে স্প্যানিশরা মেক্সিকোতে আক্রমণ চালায়। তারপর তারা খেয়াল করেছিল সমগ্র মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলের উপর টেনোচকাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তারা মূলত এই টেনোচকা রাজাদের থেকেই সবথেকে বড় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তাদের লেখা ইতিহাসে টেনোচকা রাজারা পরিচিতি পেয়েছে আজটেক নামে। বর্তমান সময়েও আজটেক বলতে গেলে টেনোচকা রাজাদের কথাই বলা হয়। আকামাপিচটলি থেকে শুরু করে সেখানে প্রায় ১১ জন রাজা শাসন করেছিলেন।

অর্জন : নানাবিধ যুদ্ধবিগ্রহে বেশির ভাগ সময় পার করলেও বিশ্ব সভ্যতায় আজটেকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তারা বিশেষ ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল। সুদৃশ্য ভাসমান বাগান তৈরির কৃতিত্বও তাদের। তারা প্রশস্ত রাস্তা তৈরির মাধ্যমে নিজেদের শহরগুলোকে সংযুক্ত করেছিল। আজটেকদের ওল্লামাকে (Ollama) বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয়তম খেলা ফুটবল তথা সকারের আদিরূপ হিসেবে মনে করা হয়।

একক কাজ : আজটেক সভ্যতার নিদর্শনগুলো কোন শহরে পাওয়া যায় তা বর্ণনা দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মিশরীয়রা সর্বপ্রথম কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ আবিষ্কার করে?

ক. ২৩টি খ. ২৪টি গ. ২৫টি ঘ. ২৬টি

২. মিশরীয়দের কাছে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন?

ক. মিশরীয়রা সর্বক্ষেত্রে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল খ. অভিজাত সম্প্রদায় ধর্মের গুরুত্ব দিত

গ. পুরোহিতরা দেশ শাসন করত ঘ. মিশরীয়রা ধর্মে বিশ্বাসী ছিল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের পরিবেশনা দেখে সীমা ও তার পরিবার অভিভূত হয়। অনুষ্ঠান দেখে সীমার একটি সভ্যতার কথা মনে পড়ল এবং সে তার স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে ধারণা নেয়।

৩. সীমার কোন সভ্যতার কথা মনে পড়ে?

ক. রোমান খ. গ্রিক গ. চৈনিক ঘ. সিন্ধু

৪. এ ধরনের আয়োজনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে–

i. অর্থনৈতিক ঐক্য ii. সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় iii. রাজনৈতিক সমঝোতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এখানে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদী-তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যার পানি নেমে গেলে তীরবর্তী এলাকায় পলি জমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঐ অঞ্চলে চাষাবাদ করে কৃষকরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে।

ক. কোন রাজা রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. রোমে তিনজনের শাসন টেকেনি কেন? বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার সাথে কোন সভ্যতার কোন অববাহিকার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সভ্যতার বিকাশে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার জনপদ

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় তেরো শতক পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে। আবার কেউ কেউ খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ছয় শতক পর্যন্ত সময়কালকে আদি ঐতিহাসিক যুগ এবং খ্রিষ্টীয় সাত শতক থেকে তেরো শতক পর্যন্ত সময়কালকে প্রাক-মধ্যযুগ বলেও যুগ বিভাজন করে থাকেন।

প্রাচীন সীমারেখা ও বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

প্রাচীনকাল থেকে অনেকবার আঞ্চলিক বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ফলে এর সীমারেখারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিশাল নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমার ছাড়া সমগ্র দেশটির বাকি সীমারেখা ঘিরে রেখেছে ভারত। এর অধিকাংশ অঞ্চলই সমভূমি। অসংখ্য নদ-নদী আর খাল-বিল ছড়িয়ে আছে এদেশের বুকজুড়ে। মূল নদ-নদীগুলো হচ্ছে পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও করতোয়া।

কোন দেশের মানুষের জীবনাচরণ ও ইতিহাসের ওপর সে দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। এ জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণে এত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের বিশাল সমভূমি আর প্রচুর নদ-নদী থাকায় এদেশের যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের একটি বড় মাধ্যম নদীপথ। পাশাপাশি উর্বর ভূমির কারণে কৃষিভিত্তিক সমাজও গড়ে ওঠে।

এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। আবার ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় বাংলাদেশের মানুষকে, তাই তারা হয়ে ওঠে সংগ্রামী। শুধু স্বভাব চরিত্র নয়, বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য তালিকা, পোশাক, ঘর-বাড়ি সবকিছুই এদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বৈচিত্র্যময় এই প্রাকৃতিক অবস্থান প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলার মানুষকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। নদ-নদী এ দেশকে বহুকাল আড়াল করে রেখেছিল বিদেশি শক্তির লোভাতুর দৃষ্টি থেকে। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের ব্যবধানে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- মানচিত্রে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত ও বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার তথ্য অনুসন্ধানে জনপদগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভে জনপদগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

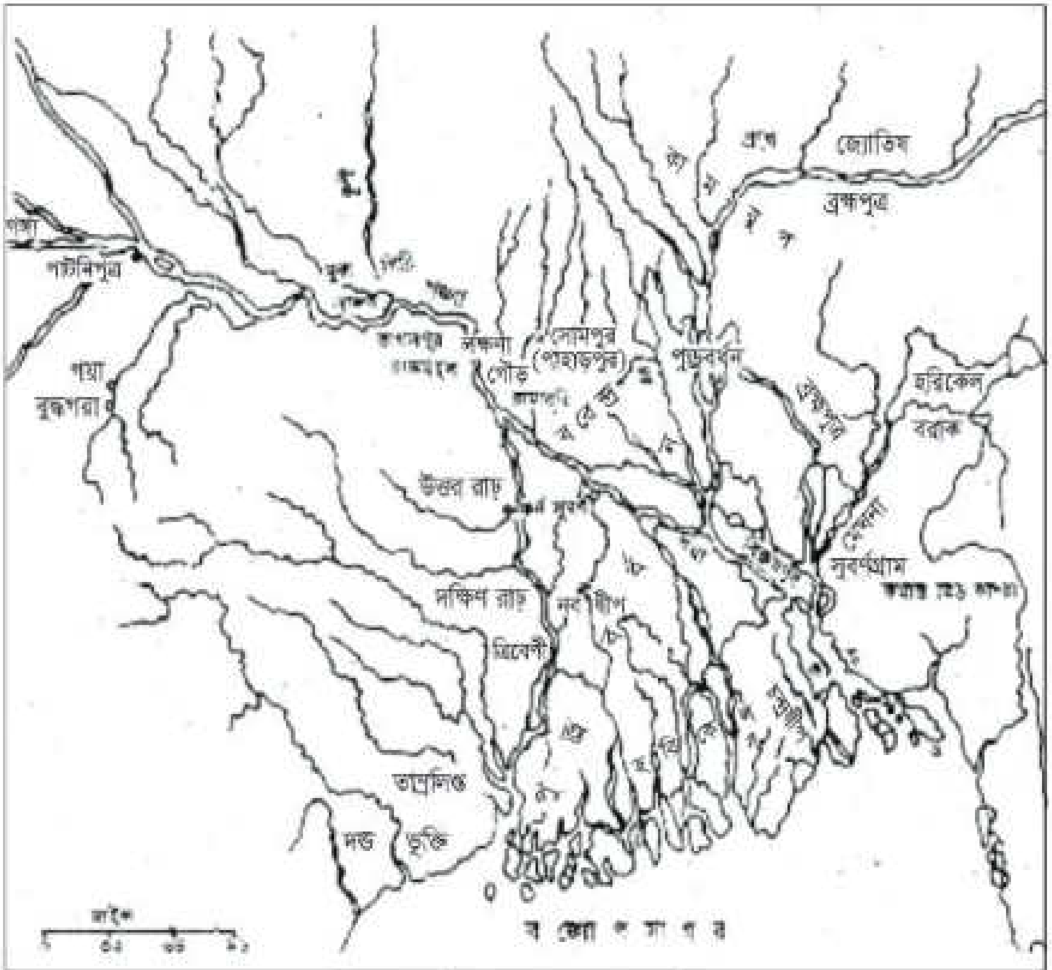

চিত্র-১৬ : প্রাচীন বাংলার জনপদের মানচিত্র

জনপদ

প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার কৃষিনির্ভর এই ছোট ছোট জনবসতিগুলোকেই বলা হয় জনপদ।

নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

গৌড় : ষষ্ঠ শতকে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে গৌড় রাজ্য বলে একটি স্বাধীন রাজ্যের কথা জানা যায়। সপ্তম শতকে শশাঙ্ককে গৌড়রাজ বলা হতো। এ সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল এর অবস্থান। বাংলায় তুর্কি বিজয়ের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হতো।

বঙ্গ : বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করতো। তাই জনপদটি পরিচিত 'বঙ্গ' নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়—একটি বিক্রমপুর ও আরেকটি নাব্য। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালির নিচু জলাভূমি এ নব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গ রাজ্যে পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন : ধর্মাদীপ্ত, দ্বাদশাদীপ্ত, সুধন্যাদীপ্ত, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব।

পুণ্ড্র : পুণ্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। খুব সম্ভবত পুণ্ড্র বলে একটি জনগোষ্ঠী এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি এখানে পাওয়া যায়। লিপিটির নাম মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে প্রাপ্ত এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি।

চিত্র-১৭ : মহাস্থানগড়, বগুড়া

হরিকেল : সপ্তম শতকের লেখকরা হরিকেল নামে অপর একটি জনপদের বর্ণনা করেছেন। এ জনপদের অবস্থান ছিল বাংলার পূর্ব প্রান্তে। মনে করা হয়, আধুনিক সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই জনপদ বিস্তৃত ছিল।

সমতট : পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের পাশাপাশি সমতটের অবস্থান। সমতটের রাজধানী বড় কামতা এবং দেবপর্বত কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরার প্রাচীন অংশই সমতট। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। শালবন বিহার এদের অন্যতম।

বরেন্দ্র : বরেন্দ্রী, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রভূমি নামে প্রাচীন বাংলায় অপর একটি জনপদের কথা জানা যায়। এটিও উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। অনুমান করা হয়, পুণ্ড্রের একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্রর অবস্থান ছিল। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক এলাকা এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র বিস্তৃত ছিল।

তাম্রলিপ্তি : হরিকেলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল তাম্রলিপ্তি জনপদ। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকই ছিল তাম্রলিপ্তির প্রাণকেন্দ্র। সপ্তম শতক থেকে এটি দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।

চন্দ্রদ্বীপ : প্রাচীন বাংলায় আরও একটি ক্ষুদ্র জনপদের নাম পাওয়া যায়। এটি হলো চন্দ্রদ্বীপ। বর্তমান বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র। এ প্রাচীন জনপদটি বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন বাংলার জনপদ থেকে আমরা তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি। প্রাচীন বাংলায় তখন কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। শক্তিশালী শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন।

একক কাজ : প্রাচীন বাংলা যে কোনো চারটি জনপদের নাম ও সেগুলোর অবস্থানের একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌড়ের রাজধানী কোথায় ছিল?

ক. কর্ণসুবর্ণ　　খ. নাব্য

গ. বিক্রমপুর　　ঘ. হরিকেল

২. তাম্রলিপ্তি জনপদটি ছিল—

i. সমুদ্র উপকূলবর্তী খুব নিচু ও আর্দ্র

ii. স্থল বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত

iii. নৌ চলাচলের জন্য অতি উত্তম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শিলা শীতকালীন ছুটিতে মা-বাবার সাথে রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রাচীন নিদর্শনের সাথে পরিচিতি লাভ করে। এর মধ্যে বিশেষ করে ছিল পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি। সে জানতে পারে এটি ছিল বাংলাদেশে পাওয়া প্রাচীন শিলালিপি এবং সম্রাট অশোকের সময় এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

৩. শিলার পরিচিত হওয়া নিদর্শনগুলো প্রাচীন কোন জনপদের ইঙ্গিত বহন করে?

ক. গৌড়　　খ. পুণ্ড্র

গ. সমতট　　ঘ. বরেন্দ্র

৪. উক্ত জনপদটি প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ, কারণ এটি—
   i. সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন
   ii. সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে পরিচিত
   iii. খ্যাতিপূর্ণ নৌ-বাণিজ্যিক কেন্দ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

শালবন বিহার

ক. জনপদ বলতে কী বোঝায়?

খ. গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল কোনটি?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিদর্শনটি প্রাচীন কোন জনপদে অবস্থিত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত জনপদটিই প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রাচীন বাংলায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রাজবংশের কথা জানা যায়। প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজবংশ হলো মৌর্যবংশ। এরপর ধারাবাহিকভাবে শুঙ্গ, কুশান, গুপ্তরা শাসন করে। গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটে। এরমধ্যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। রাজা শশাঙ্কের কোনো স্থায়ী শক্তিশালী উত্তরাধিকার ছিল না। ফলে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় এক'শ বছর বাংলায় অরাজকতা বিরাজমান ছিল। এরপর পাল রাজবংশ ক্ষমতায় এসে প্রায় চার'শ বছর রাজ্য শাসন করে। পাল শাসনের অবসানের পর ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশ বাংলায় রাজ্য স্থাপন করে। তেরো শতকের প্রথম দশকে ১২০৪ সালে তুর্কি থেকে আগত একদল মুসলিম ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধাদের কাছে সেন শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় বাংলার ইতিহাসের নতুন অধ্যায়–মধ্যযুগ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও তাদের শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাক-পাল যুগের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারব;
- গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব;
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসন-ব্যবস্থা

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা

গুপ্ত যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার তেমন কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। কেননা তখনকার মানুষ আজকের মতো ইতিহাস লেখায় অভ্যস্ত ছিল না। ভারতীয় এবং বিদেশি সাহিত্যে এ সময়কার বাংলা সম্পর্কে নানা উৎস থেকে আমরা ইতিহাসের অল্পস্বল্প তথ্য পাই। বস্তুত ৩২৭-২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক যোদ্ধা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে মোটামুটিভাবে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। গ্রিক লেখকদের কথায় তখন বাংলায় 'গঙ্গারিডাই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিত–এ উভয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই 'গঙ্গারিডাই' রাজ্যের অবস্থান ছিল। গ্রিক গ্রন্থকারগণ 'গঙ্গারিডাই' ছাড়াও 'প্রাসিঅয়' নামে অপর এক রাজ্যের উল্লেখ করেছেন।

গ্রিক লেখকদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ দুই রাজ্য আলেকজান্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আলেকজান্ডার বর্তমান পাকিস্তানের বিপাশা নদীর তীর থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন।

আলেকজান্ডারের ভারত প্রত্যাগমনের মাত্র দুই বছর পর ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের ওপর মৌর্য বংশের শাসন চালু করেন। বাংলার উত্তরাংশে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব)। বাংলা তখন মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। উত্তর বঙ্গ ছাড়াও মৌর্য শাসন কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), তাম্রলিপ্তি (বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের তমলুক জেলা) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মৌর্যরাই ছিল ভারতের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর ভারত ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট কয়েকটি রাজবংশের অধীনে শাসিত হয়। এরপর বেশ কয়েকটি ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এর মধ্যে হূণ, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে তাদের প্রত্যেকেই বাংলা পর্যন্ত এসেছিল কি না তা বলা যায় না।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে। তখন বাংলায় কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট রাজ্য ও পশ্চিম বাংলার পুষ্করণ রাজ্য উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই বাংলার উত্তরাংশের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা অধিকৃত হলেও সমতট একটি করদ রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে ছয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার উত্তরাংশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি 'প্রদেশ' বা 'ভুক্তি' হিসেবে পরিগণিত হতো। মৌর্যদের মতো গুপ্তদের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়ের পুণ্ড্রনগর।

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই বিভিন্ন যোদ্ধা জাতির সঙ্গে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে গুপ্ত শাসনের অবসান ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তদের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই সুযোগে বাংলায় দুইটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বঙ্গ। এর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। দ্বিতীয় রাজ্যের নাম গৌড়। এর অবস্থান ছিল বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে। এ গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত।

একক কাজ : বাংলার ইতিহাসে বঙ্গ ও গৌড় জনপদ দুইটির ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখ করো।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তাম্র শাসন (তামার পাতে খোদাই করা রাজার জমি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল, বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ) থেকে জানা যায় যে, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচার দেব, সুধন্যাদিত্য এবং দ্বাদশাদিত্য নামে পাঁচজন রাজা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করতেন। তাঁরা সবাই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের রাজত্বকাল ছিল ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

কোন সময়ে এবং কীভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী বঙ্গ রাজ্যের অবসান ঘটেছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা কীর্তি বর্মণের হাতে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের অবসান ঘটেছিল। কেউ কেউ বলেন, স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থানকেও দায়ী করেন। আবার স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতনের পেছনে কিছু সামন্ত রাজার উত্থানকেও দায়ী করা হয়। উল্লেখ্য যে, সমসাময়িক কালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বঙ্গ ও সমতট রাজ্যে ভদ্র, খড়্গ, দেব, রাত, নাথ প্রভৃতি বংশের স্বাধীন ও সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটেছিল।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানের পর ষষ্ঠ শতকে 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ ভূখণ্ডই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মৌখরি ও চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে সামন্তরাজা শশাঙ্ক ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে ক্ষমতা অধিকার করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্ক : যথাযথ উৎসের অভাবে শশাঙ্কের পরিচয়, তাঁর উত্থান ও জীবন কাহিনি সঠিকভাবে জানা যায় না। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো স্থানের ক্ষমতাশালীকে বলা হতো 'মহাসামন্ত'। ধারণা করা হয় শশাংক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের একজন 'মহাসামন্ত'।

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি গৌড়ে অধিকার স্থাপন করে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উড়িষ্যার উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) এবং বিহারের মগধ ও পশ্চিমে বারানসী পর্যন্ত তার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। একটি পুষ্যভূতি রাজবংশের অধীনে থানেশ্বর এবং অন্যটি মৌখরি রাজবংশের অধীনে কান্যকুব্জ (কনৌজ)।

এ সময় মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাণ পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিয়ে করেন। ফলে এ দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন ছিলেন রাজ্যশ্রীর দুই ভাই। শশাঙ্ক মৌখরিদের উৎখাত করার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হন। এ জন্য তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

শশাঙ্ক উত্তর ভারতে পৌছার পূর্বেই দেবগুপ্তের হাতে গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যশ্রীকে বন্দি করা হয়। দেবগুপ্ত এবার থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। থানেশ্বরের রাজা তখন রাজ্যবর্ধন। তিনি পথিমধ্যে দেবগুপ্তকে বাধা দেন। দেবগুপ্ত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্ধন এবার অগ্রসর হন কনৌজের দিকে। তিনি পথিমধ্যে শশাঙ্কের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও বন্দি হন। পরে তাকে হত্যা করা হয়।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন কনৌজ ও থানেশ্বরের অধিপতি হন। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। কামরূপের সাথে শশাঙ্কের আদৌ কোনো সংঘর্ষ হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে সঠিকভাবে জানা যায় না। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে শশাঙ্ক মৃত্যুবরণ করেন।

শশাঙ্ক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। হর্ষবর্ধনের গুণমুগ্ধ সুয়ান জাং (হিউয়েন সাং) শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষীসহ নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। যাহোক, সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট নাম।

কাজ : যে সকল শক্তির সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষ হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

মাৎস্যন্যায় ও পাল বংশ (৭৫০–১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এক'শ বছর বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের আক্রমণ অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে ধর্ম পালের 'খালিমপুর' তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে

বলে 'মাৎস্যন্যায়'। শব্দটি প্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলার সবল অধিপতিরা 'মাৎস্যন্যায়'-এর মতো ছোট রাজ্যগুলোকে গ্রাস করছিলেন। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘদিনের অরাজকতায় বাংলায় ছিল অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তৎকালীন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্থির করলেন যে, তারা পরস্পর বিবাদ ভুলে একজনকে রাজপদে মনোনীত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার নেতৃত্ব স্বীকার করবেন। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রথম যিনি মনোনীত হন তিনি গোপাল, অনেকেই এই প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী শাসক ধর্মপালের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ খালিমপুর তাম্রলিপি থেকে গোপালের এ নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়।

গোপাল প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম পাল বংশ। গোপালের পিতার নাম বপ্যট। পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। তাদের নামের আগে কোনো রাজকীয় উপাধি দেখা যায়নি। এতে মনে করা হয়, তারা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাল রাজত্বের শুরু হয়। পাল বংশের রাজাগণ একটানা চার'শ বছর শাসন করেন। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বাংলার উত্তর এবং পশ্চিমের বিরাট অংশই রাজ্যভুক্ত করেন। ইতিহাস গবেষকগণের অনেকেই মনে করেন, গোপাল ৭৫০ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

একক কাজ : 'মাৎস্যন্যায়' কী? সমাজে এর প্রকাশ কীরূপ ছিল?

গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। নাম, যশ ও খ্যাতির দিক থেকে পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন এগিয়ে। তার রাজ্য বিহার পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। একটি বাংলার পাল, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে ক্ষমতা প্রদর্শন ও আধিপত্য বিস্তারের এ যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। আট শতকের শেষ দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। তবুও ধর্মপাল এ সময় তার ক্ষমতাবলয়ের বাইরে বেশ কিছু স্থান দখল করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ দখল করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষে ধর্মপাল কয়েকবার পরাজিত হলেও তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। এ সংঘর্ষের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ পরিস্থিতি ও দুর্বলতার সুযোগে তিনি কান্যকুব্জে তার প্রভাববলয় সম্প্রসারণ করে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেন। তাম্রশাসনসহ অন্যান্য সূত্রে জানা যায় তিনি নাকি চোখের ইশারায় চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন। ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। ধর্মপাল ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম উপাধি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ভাগলপুরের পূর্ব দিকে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার বা মঠ নির্মাণ করেন। ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম বা উপাধি ছিল 'বিক্রমশীল'। এ নামানুসারে বিহারটি 'বিক্রমশীল বিহার' নামে খ্যাত ছিল। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহার বাংলা ও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও

চিত্র-১৮ : সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ

বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নবম শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত এটি সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিব্বতের অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করতে আসত এবং এখানকার অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপাল এক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত। এই স্থাপত্য জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এটি ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহার। ওদন্তপুরীতেও (ভারতের বিহার প্রদেশ) তিনি একটি বিহার নির্মাণ করেন। লামা তারনাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভিজাতদের প্রতি ধর্মপাল সমান পৃষ্ঠপোষকতা ছিলেন। নিজে বৌদ্ধ হলেও তিনি পর ধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সঙ্গে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি নিজে শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতিটি ধর্মের লোক যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতেন। নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য তিনি করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। তিনি যাদের ভূমি দান করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর বংশধরগণ অনেকদিন ধরে পাল রাজাদের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল নানাবিধ কারণে আলোচিত শাসক। পঞ্চাশ বছর পূর্বের অরাজকতা দূর করে প্রবল শক্তিশালী একজন শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

একক কাজ : ধর্মপাল শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। এর পক্ষে তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। পিতার মতো তিনিও রাজ্যসীমা বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন। দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের কিছু স্থান তাঁর অধিকারে এসেছিল উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।

চিত্র-১৯ : পাল সাম্রাজ্যের মানচিত্র

দেবপাল বৌদ্ধধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধমঠগুলোর তিনিই সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মুঙ্গেরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। জাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ বালপুত্রদেবকে নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রামও প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবপাল বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বর্তমান এশিয়ার ভৌগোলিক সীমানায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ইন্দ্রগুপ্ত নামক ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই দেবপালের শাসন কালে উত্তর-ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে শুরু করে। তার মৃত্যুর পর কয়েকজন উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন। তাঁরা পাল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ঠেকাতে পারেননি। এসব দুর্বল রাজার সময়ে উত্তর ভারতের কতিপয় যোদ্ধা রাজার আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে এ সময়ে পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষে কম্বোজ রাজবংশের উত্থান ঘটে।

এভাবে পাল সাম্রাজ্য যখন অবনতির দিকে, তখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন রাজা মহীপাল (আনুমানিক ৯৯৫-১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি কম্বোজদের বিতাড়িত করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি রাজ্য বিজয়ে মনোযোগ দেন। তাঁর সাম্রাজ্য বারাণসী এবং মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়ে ভারতের প্রবল কয়েকটি রাজ শক্তির বিরুদ্ধে নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা মহীপাল নালন্দায় বারাণসীতে কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি তার ৫০ বছর রাজত্বকালে জনকল্যাণকর কাজের প্রতিও মনোযোগী ছিলেন। বাংলার অনেক দীঘি ও নগরী এখনও তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নগরগুলো হলো রংপুরের মাহীগঞ্জ, বগুড়ার মাহীপুর, নওগাঁর মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী। আর দীঘিগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি ও মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগরদীঘি বিখ্যাত।

দলীয় কাজ : প্রথম মহীপালের প্রতিষ্ঠিত শহর ও দীঘিগুলোর নাম ও অবস্থান উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মহীপাল পরবর্তীকালের দুর্বল রাজাদের সময় একের পর এক যখন আক্রমণ ঘটতে থাকে তখন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও বিরোধ ও অনৈক্য দেখা দেয়। এই সুযোগে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মহীপালের সময় বাংলার উত্তরাংশের বরেন্দ্র এলাকার সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এ বিদ্রোহ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈবর্ত বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা দিব্যোক বা দিব্য। বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে সংঘটিত এ বিদ্রোহে দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র দখল করে নেয়া হয়।

বরেন্দ্র যখন কৈবর্তদের দখলে, তখন পাল বংশের শেষ প্রতাপশালী শাসক রাজা রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রিষ্টাব্দ) পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' কাব্য থেকে রামপালের জীবনকথা জানা যায়। রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। রামপালকে সৈন্য, অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসেন উড়িষ্যা, ঢেক্করি, মগধ, রাঢ় দেশসহ চৌদ্দটি রাজ্যের রাজা। যুদ্ধে কৈবর্তরা পরাজিত হলে রামপাল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহের কাছাকাছি 'রামাবতী' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী পাল রাজাদের শাসনকালে রামাবতীই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। পিতৃভূমি বরেন্দ্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিনি মগধ, উড়িষ্যা ও কামরূপের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২১

পাল বংশের পরবর্তী শাসকগণের পক্ষে পালবংশের হাল ধরা সম্ভব ছিল না। এ সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। অবশেষে বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিজয় সেন মদন পালের হাত থেকে পাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

> **দলীয় কাজ :** পাল সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে রামপাল কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা চিহ্নিত কর।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য

পাল যুগের অধিকাংশ সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। তখন এ অংশটি ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু রাজবংশের রাজারা কখনো পাল রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে তাদের এলাকা শাসন করতেন, আবার কখনো পাল রাজাদের অধীনতা স্বীকার করে চলতেন। এ সময়ের দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় খড়্গ, দেব, চন্দ্র, বর্ম, দাস, রাড নামক জানা রাজবংশের উত্থান ঘটে।

খড়্গ বংশ : সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজারা কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এ সময় খড়্গ বংশের জাত খড়্গ, দেব খড়্গ, রাজভট্ট খড়্গ প্রমুখ রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত বাসকরা কুমিল্লা জেলার বড় কামতার প্রাচীন নাম। খড়্গদের আধিপত্য ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশ ও বাংলাদেশের নোয়াখালী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দেব বংশ : অষ্টম শতকের শুরুতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেব বংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন শ্রী শান্তিদেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দদেব ও শ্রী ভবদেব।

দেব রাজারা শক্তিধর ছিলেন। তাঁদের নামের সাথে যুক্ত থাকতো বড় বড় উপাধি। যেমন– পরম সৌগত, পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। তাঁদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতীর কাছে ছিল এ দেবপর্বত। দেবদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল সমগ্র সমতট এলাকায়। আনুমানিক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেব রাজারা শাসন করেন। পাল রাজাদের মতো দেব রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধ।

কান্তিদেব : দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় হরিকেল জনপদে নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন কান্তিদেব। দেব রাজবংশের সঙ্গে কান্তিদেবের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তা জানা যায় না। বর্তমান সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। তার রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। বর্তমান এ নামে কোনো রাজ্যের অস্তিত্ব নেই। এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্র বংশ বলে পরিচিত নতুন এক শক্তির উদয় হয়।

চন্দ্র বংশ: দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি স্বাধীন রাজবংশ ছিল চন্দ্র বংশ দশম শতকের শুরু থেকে এগারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেড়শ' বছর এ বংশের রাজারা শাসন করেন। চন্দ্রবংশের প্রথম নৃপতি পূর্ণচন্দ্র ও তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র রোহিতগিরির ভূস্বামী ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এ বংশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। তার উপাধি ছিল 'মহারাজাধিরাজ'। ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা), বঙ্গ ও সমতট অর্থাৎ সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। লালমাইয়ের পাহাড়ি এলাকা ছিল চন্দ্র রাজাদের শাসন কেন্দ্র। এ পাহাড় প্রাচীনকালে রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল। আনুমানিক ত্রিশ বছরকাল (৯০০-৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজত্ব করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র ছিলেন চন্দ্র বংশের প্রভাবশালী শাসক। তিনি 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও উত্তর-পূর্ব কামরূপ ও উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে তিনি তাঁর রাজধানী গড়ে তোলেন। শ্রীচন্দ্র প্রায় ৪৫ বছর (আনু. ৯৩০-৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনু. ৯৭৫-১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) ও পৌত্র লডহচন্দ্র (আনু. ১০০০-১০২০ খ্রিষ্টাব্দ) চন্দ্র বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। লডহচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন শেষ চন্দ্র রাজা। তার রাজত্বকালে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ও কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করেন। এই দুই বৈদেশিক আক্রমণ চন্দ্র শাসনের অবসান ঘটায়।

বর্ম বংশ : এগারো শতকের শেষভাগে পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ বংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা বাংলায় এসেছিল বলে ধারণা করা হয়। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় জাতবর্মা কলচুরিরাজ কর্ণের সাহায্য ও সমর্থনে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্মদের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবর্মা একটানা ৪৬ বছর রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

একক কাজ : নিম্নের ছকের এলোমেলো তথ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাও।

ক্রমিক নং	বংশ/রাজ্যের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
১	চন্দ্র বংশ	অষ্টম শতক
২	কান্তিদেবের রাজ্য	এগারো শতক
৩	খড়্গ বংশ	দশম শতক
৪	বর্ম বংশ	নবম শতক
৫	সেন বংশ	সপ্তম শতক

সেন বংশ (১০৬১-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল বংশের অবসানের পর এগারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় সেন রাজবংশের সূচনা হয়। এ বংশের গুরুত্বপূর্ণ তিনজন রাজা ছিলেন বিজয়সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন। তাদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। কিন্তু তিনি কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। তিনি পাল রাজা রামপালের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন স্বাধীন ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় তিনি রামপালকে সাহায্য করেন। একাদশ শতকে দক্ষিণ রাঢ় শূর বংশের অধিকারে ছিল। এ বংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে তিনি বিয়ে করেন। বরেন্দ্র উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করার বিনিময়ে বিজয় সেন স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান। আবার দক্ষিণ রাঢ়ের শূর বংশের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে রাঢ় বিজয় সেনের অধিকারে আসে। এরপর বিজয় সেন বর্ম রাজাকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা সেন অধিকারে নিয়ে আসেন। শেষ পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজয় সেন মদনপালকে পরাজিত করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা থেকে পালদের বিতাড়িত করে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এরপর তিনি কামরূপ, কলিঙ্গ ও মিথিলা আক্রমণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী। দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা হয় বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। শিব অনুরাগী বিজয় সেন পরম মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। সেন বংশের অধীনেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল।

বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। রাজ্য রক্ষার পাশাপাশি তিনি মগধ ও মিথিলাও অধিকার করে সেন শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। চালুক্য রাজকন্যা রমা দেবীকে তিনি বিয়ে করেন। অন্যান্য উপাধির সাথে বল্লাল সেন নিজের নামের সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

বল্লাল সেন বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। গ্রন্থদ্বয় তার সময়ের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক বল্লাল সেনের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। এসময় তার প্রবর্তিত 'কৌলীন্য প্রথা' অনুসারে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদের কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

একক কাজ : সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে রাজা বল্লাল সেনের অবদান কী তা উল্লেখ কর।

বল্লাল সেনের পর তার পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় লক্ষণ সেনও দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রাগ-জ্যোতিষ (আসাম), গৌড়, কলিঙ্গ কাশী, মগধ প্রভৃতি স্থান সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা, রাজার বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে গৌড় হয়ে ওঠে ষড়যন্ত্র ও অন্তর্বিরোধের কেন্দ্র। এর পর ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সুন্দরবন এলাকায় ডোম্মন পাল বিদ্রোহী হয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী লক্ষণ সেন পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেছিলেন। লক্ষণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। তার রাজসভায় ধই, শরণ, উমাপতি ধর, জয়দেব প্রমুখ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল।

পিতা ও পিতামহের শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করা লক্ষণ সেনের উপাধির ছিলো 'পরম বৈষ্ণব'। তবকাত ই নাসিরি রচয়িতা ঐতিহাসিক মিনহাজ তার দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তেরো শতকের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন পালিয়ে নদীপথে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর বখতিয়ার খলজি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা সহজেই দখল করে নেন। লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় তুর্কিদের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমপুর অবস্থান করে লক্ষণ সেন আরও ২/৩ বছর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করলেও লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে ছিল। সেন রাজত্বকালে বাংলায় হিন্দুধর্ম বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

২০২৫

দলীয় কাজ : প্রাচীন বাংলার শাসকগণ কেন বিভিন্ন উপাধি ধারণ করতেন? উপাধিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলার শাসন-ব্যবস্থা

গুপ্ত শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতির সম্বন্ধে বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎকালীন কৌম সমাজে রাজা বা রাজত্ব না থাকলেও শাসন পদ্ধতি হিসাবে সবধরনের পঞ্চায়েতী প্রথার প্রচলন ছিল। যে প্রথায় নির্বাচিত দলনেতা স্থানীয় শাসনব্যবস্থার নেতৃত্ব দিতেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই বাংলায় রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল।

গুপ্তদের সময় বাংলার শাসন-পদ্ধতির পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়। আনুমানিক দুই-তিন শতকে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুন্ড্রনগর-বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ে। 'মহামাত্র' নামক একজন রাজপ্রতিনিধির মাধ্যমে তখন বাংলায় মৌর্য শাসনকার্য পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে বাংলার কিছু অংশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে বাংলার কিছু অংশ সরাসরি গুপ্তদের শাসনাধীন ছিল না। মহারাজা উপাধিধারী মহাসামন্তগণ গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্বকে মেনে নিয়ে প্রায় স্বাধীন ও আলাদাভাবে শাসন করতেন।

সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের অধীন বাংলা ভূখণ্ডের অংশগুলো কয়েকটি প্রশাসনিক প্রথাভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক 'ভুক্তি' আবার কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে এবং প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সবচেয়ে ছোট শাসন বিভাগ।

বর্তমান সময়ের বিভাগের সঙ্গে তুলনীয় ভুক্তির শাসনকর্তা গুপ্ত রাজা নিজেই নিয়োগ করতেন। সেখানে রাজকুমার বা রাজপরিবার থেকে এই 'উপরিক' তথা ভুক্তিপতি নিয়োগে প্রাধান্য দেওয়া হতো। বর্তমান সময়ের জেলার সাথে তুলনীয় বিষয়ের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন উপরিক মহারাজা বা সম্রাট স্বয়ং।

ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গুপ্তবংশের শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে বঙ্গ স্বাধীন ও আলাদা রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন বঙ্গে যে নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা মূলত গুপ্ত যুগের প্রাদেশিক শাসনের মতোই ছিল। গুপ্তদের সামন্তনির্ভর শাসন এ যুগে আরও প্রসার লাভ করেছেন। গুপ্তরাজাদের মতো বাংলার সামন্ত রাজাগণও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। এরাও বিভিন্ন শ্রেণির বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন।

গুপ্ত পরবর্তীকালে পাল যুগেও শাসনব্যবস্থার মূল কথা ছিল রাজতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা স্বয়ং। তবে রাজপরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ হতো। এ সময় থেকে সর্বপ্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী।

রাজ্যের সকল প্রকার শাসনকার্যের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট শাসন বিভাগ ছিল। এর প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন অধিপতি নিযুক্ত থাকতেন। রাজা, মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল। এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল প্রধান। উৎপন্ন শস্যের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য হতো। যেমন—ভাগ, ভোগ, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি। কতগুলো উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য দেয় কর, ব্যবসা-বাণিজ্যে শুল্ক, খেয়াঘাট থেকে আদায়কৃত মাশুল ইত্যাদি ছিল রাজ্যের আয়ের কয়েকটি উৎস। বনভূমি ছিল রাজ্যের সম্পদ। যা রাজ্যের আয়ের একটি অন্যতম উৎস ছিল।

বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব ও দলিল বিভাগ দেখাশোনা করার ব্যবস্থা ছিল। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করার জন্য জমি জরিপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। রাজস্ব আদায় করা হতো মুদ্রায় বা শস্যের মাধ্যমে। পাল শাসনামলে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বাহিনী, সামরিক বাহিনী (পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রণতরী) ছিল।

গুপ্তদের মতো পালদের সময়েও সামন্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের নানা উপাধি ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের শৌর্য ও বীর্য সামন্তদের অধীনতায় থাকতে বাধ্য করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতার সুযোগে এসব রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতো। পাল শাসকদের শক্তিও অনেকাংশে এরূপ সামন্তরাজদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করত।

পাল রাজ্যে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল তা দক্ষিণ-পূর্ববাংলা ও সেন রাজত্বকালে রাজ্য শাসনের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সময়ে রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শাসনকার্যে যুবরাজদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হতেন।

দলীয় কাজ : প্রাচীন বাংলায় সরকারের আয়ের উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন সময়ে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ৩২১ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ৩২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২. শশাংক মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন—

i. পুষ্যভূতিদের দমন করতে
ii. মৌখরিদের দমন করতে
iii. রাজ্যশ্রীকে বন্দী করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রায়গঞ্জ ইউনিয়নে সুদীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণভাবে শাসন কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু অদক্ষ ও দুর্বল চেয়ারম্যান দুর্জয়ের শাসনামলে বিভিন্ন কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সুমনের নেতৃত্বে জনগণ বিদ্রোহ করে সুমনকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়।

৩. রায়গঞ্জের বিদ্রোহী নেতা সুমনের মধ্যে ইতিহাসের কোনো বিদ্রোহী নেতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. ভীম খ. দিব্য
গ. দ্বিতীয় মহীপাল ঘ. বিগ্রহ পাল

৪. চেয়ারম্যান দুর্জয়ের মতো উক্ত নেতার ক্ষমতাচ্যুতির কারণ–

i. বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা

ii. শাসক হিসেবে অদক্ষতা

iii. জনগণের সমস্যা সমাধানে অপারগতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii ও iii

গ. i ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অজয় তার পরিবারের পুরাতন নিবাস ত্যাগ করে নবীনগরে নতুনভাবে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে তিনি নবীনগরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি বহুবিধ কার্যসম্পাদন করেন। এছাড়া তার পরবর্তী বংশধরেরাও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন। কিন্তু তাঁর এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোকজন বৈষম্যের শিকার হতেন।

ক. বখতিয়ার খলজি কোন শতকে নদীয়া আক্রমণ করেন?

খ. সেন রাজত্বকালে সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় কেন?

গ. নবীনগরের শাসক অজয়ের কর্মকাণ্ডে কোন সেন শাসকের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকের বংশধরেরা শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২. রাজনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন বড়ুয়া তার এলাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তার এলাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুবিধার বিষয়ে তিনি মনোযোগী হন। তিনি তার পৌরসভায় শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনেও সমর্থ হন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার সুযোগ লাভ করেন।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায়?

গ. আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনগর পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে ধর্মপালের কোন কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৌমেন বড়ুয়ার দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার পিছনে কাজ করেছে ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা'– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। জন ইতিহাসের পাঠ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালের জন্য ইতিহাসের উপাদান বিস্তৃত থাকে তার চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও লোকাচার সূত্রের মধ্যে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা —

- প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতি-নীতিতে জনগণের প্রদর্শিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ বর্ণনা করতে পারব।

প্রাচীন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন

মৌর্য শাসনের পূর্বে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। আর্যপূর্ব কিছু কিছু ধর্মচিন্তা বা দর্শন পরবর্তী সময়ে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, যোগ সাধনা ইত্যাদি। এ যুগের অনেক সামাজিক প্রথা ও আচার-আচরণের প্রভাব পরবর্তী সময়ে বাংলার সমাজ জীবনে লক্ষ করা যায়। যেমন—অতিথিদের পান-সুপারি খেতে দেওয়া, গীত গাওয়া, বিয়েতে গায়ে হলুদ দেয়া, শাড়ি পরা এবং মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেয়া ইত্যাদি।

আর্যভাষী ব্রাহ্মণ্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তারা দীর্ঘদিন বাংলায় বসবাস করার ফলে এখানেও এ ব্যবস্থা চালু হয়। তখন হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারটি বর্ণের বিভাজন ছিল। তাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা–এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতো। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করা। সবচেয়ে নীচু শ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করতো। সাধারণত এক

বর্ণ বা শ্রেণির মধ্যেই বিবাহ হতো, তবে উচ্চ শ্রেণির বর ও নিম্ন শ্রেণির কনের মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসব ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু হয়।

বাংলার মেয়েরাও লেখাপড়া শিখত। সে যুগে পর্দাপ্রথা ছিল না। একটি বিবাহ ছিল সমাজের নিয়ম। তবে পুরুষেরা বহু স্ত্রী রাখতে পারত। বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাসিতা ত্যাগ করতে হতো। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে হতো। এ প্রথাকে বলা হয় 'সতীদাহ প্রথা'। ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোনো আইনগত অধিকার ছিল না।

বাংলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য বর্তমান সময়ের মতো তখনও ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। চাল থেকে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেত। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, কাঁকরোল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। তবে ডালের কথা কোথাও বলা নেই। দুধ, ডাবের পানি, আখের রস, তালরসসহ নানা প্রকার পানীয় খাবার প্রচলিত ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাজা-মহারাজা ও ধনীদের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোনো আড়ম্বর তখন ছিল না। উভয়ই সেলাই ছাড়া এক বস্ত্র পরতো। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল। নর-নারী উভয়ের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। তারা কানে কুণ্ডল, গলায় হার, আঙুলে আংটি, হাতে বালা ও পায়ে মল পরিধান করত। মেয়েরাই কেবল হাতে শঙ্খ পরত এবং চুড়ি পরতে ভালোবাসত। মণি-মুক্তা ও দামি সোনা-রুপার অলংকার ধনীরা ব্যবহার করত। মেয়েরা নানাপ্রকার খোঁপা বাঁধত। পুরুষদের বাবরি চুল কাঁধের ওপর ঝুলে থাকত। কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধনসামগ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সুগন্ধির ব্যবহারের প্রচলন ছিল। মেয়েদের সাজসজ্জায় আলতা, সিঁদুর ও কুমকুমের ব্যবহারও তখন প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা মাঝে মধ্যে কাঠের খড়ম বা চামড়ার চটি জুতা ব্যবহার করত। তখনকার দিনে নানা রকম খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। পাশা ও দাবা খেলার প্রচলন ছিল। তবে নাচ-গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল খুব বেশি। বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল ইত্যাদি তো ছিলই, এমনকি মাটির পাত্রকেও বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হতো। কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম, নৌকাবাইচ ও বাজিকরের খেলা পুরুষদের খুব পছন্দ ছিল। নারীদের মধ্যে উদ্যান রচনা, জলক্রীড়া ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠান সে যুগেও প্রচলিত ছিল। এ উপলক্ষ্যে নানা প্রকার আমোদ-উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে বাংলায় ভাইফোঁটা, নবান্ন, রথযাত্রা, অষ্টমী স্নান, হোলি, জন্মাষ্টমী, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

এসব আমোদ-উৎসব ছাড়াও তখন বাংলার সমাজ জীবনে অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। শিশুর জন্মের পূর্বে তার মঙ্গলের জন্য গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। জন্মের পর নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপচার পালন করা হতো। প্রাচীনকালে বাংলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন তিথিতে কী খাদ্য নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং বিবাহ, শিশু বয়সে পড়াশোনা শুরু করা, বিদেশ যাত্রা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির জন্য কোন কোন সময় শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম কঠোরভাবে পালিত হতো।

প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ি ও নৌকা। খাল-বিলে চলাচলের জন্য ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করা হতো। মানুষ ছোট ছোট খাল পার হতো সাঁকো দিয়ে। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া,

ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতো। তাদের স্ত্রী-পরিজনেরা নৌকা ও পালকিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আসা-যাওয়া করতো। সর্বোপরি মনে হয় যে, আধুনিক কালের গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং সেকালের জীবনযাত্রার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। মানুষের জীবন মোটামুটি সুখের ছিল। তবে প্রাচীন বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের কথাও জানা যায়। তৎকালীন যুগের রীতি অনুযায়ী সমাজের উঁচু শ্রেণি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল মূল ক্ষমতা। এ সময় শাস্ত্রজ্ঞান চর্চায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উঁচু শ্রেণির হাতে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো। এ নিয়ন্ত্রণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অধিক হতো। শেষ দিকে সেন রাজাদের কঠোরতায় সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। সেন বংশের শাসনকালে বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি স্থবির হয়ে পড়ে। সাধারণ হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলায় তুর্কি ও পারসিক মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। এভাবে মুসলমানদের হাত ধরে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ফলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিরও পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে।

একক কাজ : প্রাচীন বাংলার মানুষের উৎসব, খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র ও খেলাধুলার পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিল্পকলা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান জনপদ। প্রাচীনকালে অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করতো আর গ্রামের আশপাশের ভূমি চাষ করে সংসার চালাতো। তাই বাংলার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে কৃষির ওপর নির্ভর করে। ধান ছিল বাংলার প্রধান ফসল। এ ছাড়া, পাট, ইক্ষু, তুলা, নীল, সরিষা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল। ফলবান বৃক্ষের মধ্যে ছিল আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর, খেজুর ইত্যাদি। এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলাও বাংলায় উৎপন্ন হতো। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মেষ, হাঁস-মুরগি, কুকুর ইত্যাদি ছিল প্রধান। লবণ ও শুঁটকি দেশের কোনো কোনো অংশে উৎপন্ন হতো।

কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের লোকদের দরকারি সবকিছু গ্রামেই তৈরি হতো। মাটির তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কলস, ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, বাসনপত্র ইত্যাদি। লোহার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দা, কুড়াল, কোদাল, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল ইত্যাদি। এছাড়া জলের পাত্র, তির, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো। বিলাসিতার নানা রকম জিনিসের জন্য স্বর্ণ-শিল্প ও মণি-মাণিক্য শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। কাঠের শিল্পও সে সময়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল। সংসারের আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি, মন্দির, পাল্কি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রথ প্রভৃতি কাঠের দ্বারাই তৈরি হতো। এছাড়া নদীপথে চলাচলের জন্য নানা প্রকার নৌকা ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য কাঠের বড় বড় নৌকা বা জাহাজ তৈরি হতো।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকে এখানে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হতো। বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা প্রাচীনকালেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি দিয়াশলাইয়ের বাকশের মতো একটি ছোট বাকশোতে ভরা যেত। কার্পাস তুলা ও রেশমের তৈরি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্যও বাংলা প্রসিদ্ধ ছিল। শণের তৈরি মোটা কাপড়ও তখন প্রস্তুত হতো। জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সে সময় টিন পাওয়া যেত।

বাংলায় কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। আবার এগুলোর খুব চাহিদাও ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তাই বঙ্গের সঙ্গে প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বঙ্গের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুতি ও রেশমি কাপড়, চিনি, গুড়, লবণ, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা, চাল, নারকেল, সুপারি, ঔষধ তৈরির গাছপালা, নানা প্রকার মুক্তা ইত্যাদি।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলত। দেশের ভেতরে বাণিজ্য ছাড়াও সে সময়ে বাংলা বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল। স্থল ও জলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলতো। এ কারণে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নগর ও বাণিজ্য বন্দর গড়ে উঠেছিল। এগুলো হলো– নব্যাবশিকা, কোটীবর্ষ, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি। অবশ্য শহর ছাড়া গ্রামের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। এসব গ্রামের হাটে গ্রামে উৎপন্ন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনা হতো। সমুদ্রপথে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলতো। স্থলপথে চীন, নেপাল, ভুটান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাচীনকালে হয়ত ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য 'বিনিময় প্রথা' প্রচলিত ছিল। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা চালু থাকলেও এখানে কড়ি সবচেয়ে কম মান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

একক কাজ : প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার তালিকা তৈরি কর।
দলীয় কাজ : প্রাচীন বাংলায় সমুদ্র ও স্থলপথে কোন কোন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল ছকে দেখাও।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন স্থাপনার বেশির ভাগই ধর্মীয় স্থাপত্য। এর মধ্যে রয়েছে স্তূপ, বিহার ও মন্দির। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে এসে দেখা যায় স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে যা পাওয়া যায় তার সিংহভাগ মসজিদ কিংবা সমাধির জন্য ধর্মীয় স্থাপত্য। প্রাচীন বাংলার প্রত্নস্থান হিসেবে প্রাথমিক যুগের স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে চন্দ্রকেতুগড়, বানগড়, মঙ্গলকোট, তাম্রলিপ্তি, মহাস্থানগড় কিংবা উয়ারী-বটেশ্বর থেকে। তবে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সেখানে প্রাপ্ত নিদর্শনের স্থাপত্যিক-পরিকল্পনা, নির্মাণ-পদ্ধতি ও কাঁচামাল সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা মেলেনি।

সরাসরি বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে বিকাশ ঘটেছিল বৌদ্ধধর্মের। এই ধর্মের অনুসারীগণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে টিকে থাকে ১২ শতক পর্যন্ত। তাদের সমৃদ্ধ বিকাশের চিহ্ন হিসেবে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি, নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় অঞ্চল, দিনাজপুর, রাজশাহী, যশোরের ভরত ভায়না, ঢাকার সাভার, পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর, বিহারের নালন্দা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ-স্থাপত্য পাওয়া গিয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটের স্তূপ কিংবা ঢিবি হিসেবে প্রাপ্ত এসব নিদর্শনের মধ্য থেকে খননকৃত স্থাপত্যের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। প্রাথমিক দিকের নিদর্শন হিসেবে ময়নামতির কুটিলামুড়ার কথা বলা যায়। এখানে তিনটি স্তূপের সামনে পূর্ব দিকে কক্ষসহ তিনটি চৈত্য-হল পাওয়া গিয়েছে।

স্তূপস্থাপত্য: বৌদ্ধ-স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত স্তূপগুলোর উৎপত্তি-কাল অনির্ধারিত। এই স্তূপগুলোর বেশির ভাগ পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ বিহার সন্নিহিত এলাকায়। প্রাথমিক দিকের নিদর্শন হিসেবে কুমিল্লার কুটিলামুড়া, ইটাখোলা মুড়া, ভোজবিহার, রূপবান মুড়ার পাশাপাশি নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার পাহাড়পুর বিহারের পূর্বে অবস্থিত সত্যপীর ভিটার কথা বলা যায়। ওদিকে স্থানীয়ভাবে ডগরমুড়া নামে পরিচিত সাভারের হরিশ-রাজার বুরুজ স্তূপটির ধ্বংসাবশেষও বাংলাদেশের স্তূপ স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

বিহার: ধর্মীয় পরিব্রাজক তথা সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল হিসেবে বিহার বিখ্যাত। বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয় পিটক অনুযায়ী ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য বৃহৎ স্থাপত্যিক অবকাঠামো এবং একটি সুসংগঠিত আশ্রমকে বিহার বলা হয়। বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে অনেকগুলো বিহার স্থাপত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যশোর জেলার কেশবপুর থানার বুড়িভদ্রা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ভরত ভায়নার কথা বলা যায়।

কুমিল্লার কোটবাড়ি-সংলগ্ন লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত শালবন বিহার বাংলাদেশের বিহার স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। রাজা ভবদেব আনুমানিক সাত শতকের শেষভাগে ১১৫টি কক্ষবিশিষ্ট এই বিহার নির্মাণ করেছিলেন। অন্যদিকে আনন্দবিহারের অবস্থান কুমিল্লার শালবন বিহার থেকে দুই মাইল উত্তরে। আট শতকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় বৃহত্তম এ বিহার নির্মাণ করেছিলেন আনন্দ দেব। এখানেও বিহারের খোলা আঙিনার মাঝখানে একটি বিরাট ক্রুশাকার মন্দির রয়েছে।

ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত পাহাড়পুর বিহার তথা সোমপুর মহাবিহার নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। আট শতকে পাল সম্রাট ধর্মপাল প্রায় বর্গাকার এ বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন। এখানকার ১৭৭টি কক্ষের মধ্যে উত্তর বাহুতে ৪৫টি কক্ষ এবং অপর তিন বাহুর প্রতিটিতে ৪৪টি কক্ষ রয়েছে। বিহারের ক্রুশ আকৃতির কেন্দ্রীয় মন্দিরটি ঊর্ধ্বগামী তিনটি ধাপে নির্মাণ করা হয়েছে। এখান থেকে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের বেশ কিছু নিবেদন-স্তূপ, কেন্দ্রীয় মন্দিরের প্রতিকৃতি, পঞ্চ-মন্দির, রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর, পাকা নর্দমা ও কূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে অনেকগুলো টেরাকোটা নিদর্শন। পাহাড়পুর বিহারের পাশাপাশি নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত জগদল মহাবিহারের কথা বলা যেতে পারে। এগুলো প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন।

বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত অন্য বিহারের মধ্যে ভাসুবিহার বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত। মহাস্থানগড়ের পশ্চিমে অবস্থিত এ বিহারে প্রায় ২৬টি ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে যার নির্মাণ-উপাদান হিসেবে ইট ও মর্টার হিসেবে কাদা-মাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর বাইরে দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ থানায় অবস্থিত সীতাকোট বিহার, বিহার ধাপ তথা তোতারাম পণ্ডিতের বাড়ি, লোহানীপাড়া গ্রামের চাপড়াকোট বিহার, বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার আড়োলা গ্রামের শালিবাহন রাজার বাড়ি, ঢাকা জেলার সাভার থানায় অবস্থিত হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদের কথা বলা যেতে পারে।

শিল্পকলা: প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন মৃৎপাত্রের অলংকরণ, টেরাকোটা নিদর্শন ও ভাস্কর্যের কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থান খননে এই ধরণের নানাবিধ প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন এলাকার পুকুর খুঁড়তে গিয়েও এমন উপকরণের দেখা মিলেছে। এগুলো থেকে প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পাশাপাশি বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থান-গড়, সোমপুর বিহার, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ইটাখোলা মুড়া এবং বিহার ধাপ থেকে শিল্পকলার প্রাচীন-তম নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গিয়েছে প্রচুর স্বল্প মূল্যবান পাথরের তৈরি পুঁতি, তাবিজ-কবজ ও লকেট। ধারণা করা হয় অ্যাগেট, কার্নেলিয়ান, কোয়ার্টজ, অ্যামেথিস্ট জাতীয় স্বল্প-মূল্যবান পাথর পুঁতি তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত মুদ্রার প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে উয়ারী-বটেশ্বর ও মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া গিয়েছে অনেক ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা। এই মুদ্রায় উৎকীর্ণ প্রতীকগুলোকেও শিল্পকলার উপাদান হিসেবে ধরা যেতে পারে। উয়ারী বটেশ্বর থেকে পাওয়া গিয়েছে বিশেষ ধরণের যক্ষমূর্তি। মৃৎপাত্রের প্রারম্ভিক কালের নিদর্শন হিসেবে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ-এবং-রক্তিম মৃৎপাত্র কিংবা উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র নানাভাবে অলংকৃত। এখানে বৃত্তাকার কিংবা সরলরৈখিক নানা আঁচড়ের পাশাপাশি খিলানাকৃতির নকশাও দেখা যায়।

বাংলাদেশের শিল্পকলার অনন্য নিদর্শন পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি ও ফলক-চিত্র। এখানে উপস্থাপিত দেব-দেবীর প্রতিকৃতিগুলো পাথরের ভাস্কর্যের মতোই অনেকটা ত্রিমাত্রিক। এখানে হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি। পাশাপাশি নানা স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে পোড়ামাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের শিবলিঙ্গ। ওদিকে পাহাড়পুর বিহার, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, রূপবানমুড়া বিহার প্রভৃতি প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর টেরাকোটা নিদর্শন। গাজীপুরের শ্রীপুর থেকে পাওয়া গিয়েছে পোড়ামাটির তৈরি ৮ম শতকের একটি হর-পার্বতী মূর্তি যা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত।

বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির বাইরে অনেক সাধারণ শিল্পকলার নিদর্শনও রয়েছে এখানে। তার মধ্যে বিভিন্ন প্রাণি, পাখি ও উদ্ভিদের প্রতিকৃতির দেখা মেলে। চারটি ধারাবাহিক কালপর্ব হিসেবে গুপ্ত-পূর্ব, গুপ্ত, গুপ্তোত্তর এবং এবং পাল-সেন যুগের প্রচুর পাথরের তৈরি ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ ছিল হিন্দু দেবী ও মহামতি বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রার মূর্তি। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বোধিসত্ত্ব মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে বাংলার নানা স্থান থেকে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

অস্ট্রিক ছিল বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা। এ ভাষা আর্যদের আগমনের পর ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা। পরবর্তীকালে এ ভাষাকে সংস্কার করা হয়। পুরনো ভাষাকে সংস্কার করা হয়েছে বলে এ ভাষার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ তা মেনে নেননি। প্রাচীন যুগে আর্যদের যে ভাষায় বৈদিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল স্থানভেদে এবং সময়ের বিবর্তনে তার অনেক পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয়। অপভ্রংশ ভাষা থেকে অষ্টম বা নবম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন : কৃষ্ণ > কানু > কানাই।

বাংলা ভাষার এরূপ প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল থেকে সংগৃহীত চর্যাপদে। এ চর্যাপদগুলোর মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদগুলোর মূল্য অপরিসীম।

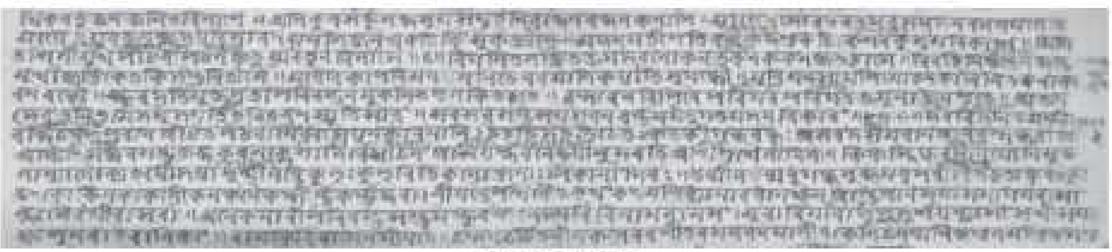

চিত্র-২৪ : চর্যাপদ

প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন বাংলায় বৈদিক ধর্মের আগে অন্য কোনো ধর্মমত ছিল কি না, সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

তবে সে সময়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ প্রকৃতি পূজা, অর্চনা ও সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। বিশ্বাসের প্রকৃতি একই রকম ছিল না। বর্ণ, কৌম, জনপদ ভেদে এদের ধর্মচর্চার বিভিন্নতা দেখা যায়। তবে সাধারণ ধর্মীয় লোকাচারের মধ্যে মনসা পূজা, বৃক্ষপূজা-সহ নানান কিছু প্রচলিত আছে। খাসিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল, বুনো রাজবংশী শবর প্রভৃতি জাতিসত্তার মানুষ এখনো দেবতার আসনে গাছ-পাথর-পাহাড়-পশু-পাখি-ফল-মুলের পূজা করে।

খ্রিষ্টপূর্ব চার শতক থেকেই উপমহাদেশের তিনটি বৃহৎ ধর্ম–বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত এখানে আর্য-বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেনি। উত্তর ভারত থেকে এসে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশের নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল। এভাবে ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

পাল যুগেও বৈদিক ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি অটুট ছিল। বর্ম ও সেন রাজাদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এই দুই বংশের রাজত্বকালে বৈদিক ধর্ম আরও প্রসার লাভ করে। তখন বৌদ্ধধর্ম অনেকখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে পৌরাণিক দেব-দেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান-ক্রিয়াকর্মের প্রচলন শুরু হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি সংস্কার বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলার বুকে দ্রুত প্রসার লাভ করলেও কালক্রমে এর মধ্যে বিবর্তন দেখা দেয়। এ যুগে পূর্বের দেব-দেবীর পরিবর্তে নতুন নতুন দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়। এ নতুন দেব-দেবীরা ছিলেন মুলত পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত দেব-দেবী। তাই এ ধর্মকে 'পৌরাণিক ধর্ম' বলা হয়। পুরোহিতরা ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করার সার্বিক দায়িত্ব লাভ করেন। ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে জটিলতা বেড়ে যায়। দেবতার বেদিতে দুধ ও ঘৃত উৎসর্গের পাশাপাশি পশুবলি বৃদ্ধি পায়। বহু বিচিত্র রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়। পৌরাণিক পূজা-পার্বণের রীতি-নীতি ও ক্রিয়াকলাপ থেকে যে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, সেগুলোর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে শিবধর্মও প্রচলিত ছিল। এ সকল দেব-দেবীর পূজা ব্যতীত শক্তি ও সূর্যপূজা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পাল রাজাদের সুদীর্ঘ চার'শ বছরের রাজত্বকালে তাঁদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা-বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

সেন যুগে বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা ব্যাপকতা লাভ করে এবং বহু মন্দির নির্মিত হয়। এ সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দাপটে বৌদ্ধধর্ম অনুসারীদের অবস্থা ম্রিয়মাণ হয়।

একক কাজ : প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর নাম উল্লেখ কর।

প্রাচীন বাংলার আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতি-নীতি

প্রাচীন বাংলায় পূজা-পার্বণ ও আমোদ-প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হতো। বিজয়া দশমীর দিন 'শাবোরৎসব' নামে একপ্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হতো। হোলাকা বা বর্তমানকালের 'হোলি' ছিল তখন অন্যতম প্রধান উৎসব। স্ত্রী-পুরুষ সকলে এতে যোগদান করতো। ভাইফোঁটা, আকাশপ্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরা, গঙ্গাস্নান, মহাঅষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান ইত্যাদি অনুষ্ঠান সেকালেও প্রচলিত ছিল।

এসব পূজা-পার্বণ আমোদ-উৎসব ব্যতীত অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। শিশুর জন্মের পূর্বে তার মঙ্গলের জন্য গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও শোষ্যন্তীহোম অনুষ্ঠিত হতো। জন্মের পর জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশনসহ অনেক উপাচার পালন করা হতো।

দৈনন্দিন জীবনে কোন তিথিতে কী কী খাদ্য ও কর্ম নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং বিবাহ, অধ্যয়ন, বিদেশ যাত্রা, তীর্থ গমন প্রভৃতির জন্য কোন কোন কাল শুভ বা অশুভ সে বিষয়ে শাস্ত্রের অনুশাসন কঠোরভাবে পালিত হতো।

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে একদিকে সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এবং অপরদিকে ব্রহ্মহত্যা, সুরা পান, চুরি করা, পরদার গমন (পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক) ইত্যাদিকে মহাপাতকের কাজ বলে গণ্য করে তার জন্য কঠোর শাস্তি ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বখ্যাত কোন কাপড় বাংলায় তৈরি হতো?

ক. রেয়ন খ. রেশমি
গ. মসলিন ঘ. পশমি

২. প্রাচীন বাংলার অর্থনীতিকে কৃষিনির্ভর বলা হয়, কেননা এ সময়ে—

i. বাংলার প্রধান ফসল ছিল ধান;
ii. ইক্ষু, তুলা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল;
iii. প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট;

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবিতা গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতিতে শালবন বিহার পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে লক্ষ করে যে, বিহারের মাঝখানে উঁচু ঢিবির উপর কেন্দ্রীয় মন্দির, চারপাশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অসংখ্য কক্ষ, দেয়ালে টেরাকোটা অঙ্কন। সবকিছু মিলিয়ে অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন।

৩. কবিতার দেখা নিদর্শনের বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন নিদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. ঢাকার আশরাফপুরের খ. চট্টগ্রামের ঝেওয়ারির
গ. নওগাঁর পাহাড়পুরের ঘ. বাঁকুড়ার বহুলাড়ার

৪. উক্ত প্রাচীন নিদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা হলো—

i. বৌদ্ধদের নির্মিত
ii. জ্ঞান সাধনার স্থান
iii. দেশে-বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. টিনা তার বান্ধবীর বড় বোন নীলার বিয়েতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। নীলার পিতা গ্রামের সম্পদশালী ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশে সুতিবস্ত্র, সিল্ক, ঔষধ, মিহি চাল রপ্তানি করেন। গ্রামে অনেক কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। দরকারি অনেক জিনিস গ্রামেই তৈরি হয়। এমন একটি গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে টিনা মুগ্ধ। বিয়ের দিন টিনা খুব সুন্দর করে সুতির শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে কুমকুম ও মাথায় ওড়না পরে সুন্দর করে চুলের খোঁপা বেঁধেছে। বিয়েবাড়িতে ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দধি ও ক্ষীর পরিবেশন করা হয়েছে।

ক. আর্যরা সমাজকে কয়টি বর্ণে বিভক্ত করেছিল?

খ. আর্য সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে বাংলার কোন আমলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নীলাদের গ্রামের আর্থিক কাঠামো তৎকালীন বাংলার প্রতিচ্ছবি'– তুমি কি উক্তিটির সঙ্গে একমত? যুক্তি দাও।

২. সৌরভ ব্যানার্জী ও প্রদীপ বণিক দুই বন্ধু এবং একই শহরে বসবাস করে। সৌরভের বাবা কাপড়ের ব্যবসা করেন। বর্তমানে তিনি সুতি কাপড় ও সিল্ক শাড়ি বিদেশে রপ্তানি করছেন। প্রদীপের বাবা ডাল, চিনি, লবণ, মসলা ইত্যাদির ব্যবসা করেন। একদিন প্রদীপ সৌরভদের বাড়িতে যায় এবং তার বোনকে দেখে নিজের বড় ভাইয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রদীপরা সৌরভদের সমগোত্রীয় নয় বিধায় উক্ত প্রস্তাব বাতিল করে দেন সৌরভের মা-বাবা।

ক. কখন থেকে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়?

খ. প্রাচীন বাংলার মানুষের অবস্থা কেমন ছিল?

গ. সৌরভের বোনের বিয়ের ব্যাপারে তার মা-বাবার মনোভাবে তৎকালীন বাংলার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর, প্রদীপের বড় ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, তা তৎকালীন বাংলার সমাজের অগ্রগতির অন্তরায়? যুক্তি দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস
(১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের সালকে বাংলায় মধ্যযুগের শুরু বলা হয়। ইতিহাসে এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ কতকগুলো যুগান্তকারী পরিবর্তন দরকার। বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তন আসেনি, এর ফলে বঙ্গের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখি পরিবর্তন আসে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা পর্বের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলার বংশানুক্রমিক শাসন এবং তাঁদের রাজনৈতিক কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলায় আফগান শাসনামল ও শাসকগণের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস ও পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- মুঘল শাসনামলে বাংলায় সুবেদার ও নবাবদের শাসন কালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা দিকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ধারাবাহিকভাবে মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান শাসকগণের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।

বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি

তেরো শতকের শুরুতে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। তাঁর বাল্য পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। উত্তর আফগানিস্তানের গরমশির (আধুনিক দাসত-ই মার্গ) এর বাসিন্দা মুহম্মদ বখতিয়ার ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক।

বখতিয়ার খলজি ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিকার অন্বেষণে গজনিতে আসেন। সেখানে তিনি শিহাবউদ্দিন ঘোরির সৈন্য বিভাগে চাকরিপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। দেখতে বাটো, অস্বাভাবিক লম্বা হাত এবং কদাকার চেহারার জন্য বখতিয়ার সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। এরূপ শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুর্কিদের নিকট অমঙ্গল বলে বিবেচিত হতো। গজনিতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকটে উপস্থিত হন। এবারও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান ভারতের মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভাগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার

জায়গির দান করেন। সেখানে বখতিয়ার তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান। ভাগবত ও ভিউলি তার শক্তিকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বখতিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ করতে শুরু করেন। এ সময়ে তার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তার সৈন্যদলে যোগদান করে। ফলে বখতিয়ারের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে তিনি দক্ষিণ বিহারে এক প্রাচীরঘেরা দুর্গের মতো স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ কোনো বাধাই দিল না। দুর্গ দখলের পর তিনি দেখলেন যে, দুর্গের অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডিত মস্তক এবং দুর্গটি বইপত্রে ভরা। জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি এক বৌদ্ধ বিহার জয় করেছেন। এটি ছিল ওদন্দ বিহার বা ওদন্তপুরী বিহার। প্রাচীনকালে এগুলিই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মচর্চার স্থান। অনেক ঐতিহাসিক এগুলিকে প্রাচীনকালের বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেন। এ সময় থেকেই মুসলমানেরা এ স্থানের নাম দেন বিহার। আজ পর্যন্ত তা বিহার নামে পরিচিত।

বিহার দখলের পর বখতিয়ার অনেক ধনরত্নসহ দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান কর্তৃক সম্মানিত হয়ে তিনি বিহারে ফিরে আসেন। অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি পরের বছর নবদ্বীপ বা নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বাংলার রাজা লক্ষণ সেন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। নদীয়া ছিল তাঁর অবকাশকালীন রাজধানী। বখতিয়ার কর্তৃক ওদন্তপুরী বিহার দখলের পর সেন সাম্রাজ্যে গভীর ভীতি বিদ্যমান ছিল। দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজা লক্ষণ সেনকে রাজধানী ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। তাদের শাস্ত্রে তুর্কি সেনা কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এছাড়া আক্রমণকারীর যে বর্ণনা শাস্ত্রে আছে, তার সঙ্গে বখতিয়ারের দেহের বর্ণনা একেবারে মিলে যায়। কিন্তু তবুও রাজা লক্ষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেননি।

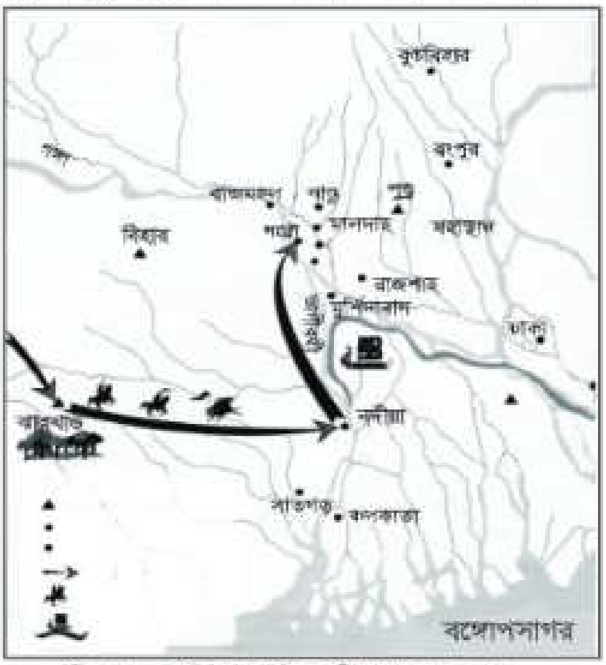

চিত্র-২৫ : বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের পথ

বিহার থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে হলে তেলিয়াগড় ও শিকড়িগড়—এই দুই গিরিপথ দিয়ে আসতে হতো। এ গিরিপথ দুটো ছিল সুরক্ষিত। তিনি প্রচলিত পথে অগ্রসর হলেন না। কিন্তু অরণ্যময় এলাকার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়াতে বখতিয়ারের সৈন্যদল খণ্ড খণ্ডভাবে অগ্রসর হয়। এভাবে বখতিয়ার খলজি যখন নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ১৭ কিংবা ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক। কথিত আছে, তিনি এত ক্ষিপ্রগতিতে পথ অতিক্রম করেছিলেন যে, মাত্র ১৭/১৮ জন সৈনিক তাকে অনুসরণ করতে পেরেছিল। আর মূল সেনাবাহিনীর বাকি অংশ তাঁর পশ্চাতেই ছিল।

অকস্মাৎ আক্রমণে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। প্রাসাদ অরক্ষিত রেখে সকলে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। ইতোমধ্যে বখতিয়ারের দ্বিতীয় দল নগরের মধ্যে এবং তৃতীয় দল তোরণ-দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। সমস্ত নগরী তখন প্রায় অবরুদ্ধ। জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। এ অবস্থায় রাজা লক্ষণ সেন বখতিয়ারের আক্রমণ

থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই দেখে নৌকাযোগে পালিয়ে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) আশ্রয় গ্রহন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে বখতিয়ার খলজির পশ্চাদ্‌গামী অবশিষ্ট সৈন্যদলও এসে উপস্থিত হলে বিনা বাধায় নদীয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে। বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বর্তমানে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দই নদীয়া জয়ের সময় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এরপর বখতিয়ার নদীয়া ত্যাগ করে লক্ষণাবতীর (গৌড়) দিকে অগ্রসর হন। তিনি লক্ষণাবতী জয় করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষণাবতীই মুসলমান আমলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। গৌড়ের পর বখতিয়ার আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার বিস্তার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার খলজি নদীয়া ও গৌড় বিজয়ের পর একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হলেও তিনি বিজয় সেনের মতো বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। পূর্ববঙ্গে লক্ষণ সেনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা আরও কিছুদিন পূর্ববঙ্গ শাসন করেছিলেন।

গৌড় বা লখনৌতি বিজয়ের দুই বছর পর বখতিয়ার খলজি তিব্বত অভিযানে বের হন। তিব্বত অভিযানই ছিল তাঁর জীবনের শেষ সমর অভিযান। কিন্তু তাঁর এ অভিযান ব্যর্থ হলে তিনি দেবকোটে ফিরে আসেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনুমান করা হয় আলি মর্দান নামে একজন আমির তাঁকে হত্যা করেছিল।

বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই ভারতের পূর্বাংশে প্রথম মুসলমানদের রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ বছরের অধিক স্থায়ী হয়েছিল (১২০৪-১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)। রাজ্য জয় করেই বখতিয়ার খলজি ক্ষান্ত ছিলেন না, বিজিত অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এতদঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তিনি ভূমিকা রাখেন। তাঁর শাসনকালে মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

বাংলায় তুর্কি শাসনের ইতিহাস

বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন বখতিয়ার খলজি। এ পর্বের প্রথম পর্যায় ছিল ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না। তাঁদের কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা খলজি মালিক, আবার কেউ কেউ তুর্কি বংশের শাসক। শাসকদের সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। তবে তাঁদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লির আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর'। এর অর্থ 'বিদ্রোহের নগরী'।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাঁর সহযোদ্ধা তিনজন খলজি মালিকের নাম জানা যায়। তাঁরা হচ্ছেন–মুহম্মদ শিরান খলজি, আলি মর্দান খলজি এবং হুসামউদ্দিন ইওজ খলজি। অনেকেরই ধারণা ছিল আলী মর্দান খলজি বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী। এ কারণে খলজি আমির ও সৈন্যরা তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন মুহম্মদ শিরান খলজিকে। তিনি কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ বখতিয়ারের হত্যাকারী বলে কথিত আলি মর্দান খলজিকে বন্দী করা হয়। পরে আলি মর্দান পালিয়ে যান এবং দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিনের সহযোগিতা লাভ করেন। দিল্লির সহযোগিতায় দুই বছর পর ফিরে আসেন আলি মর্দান খলজি। ইওজ খলজি স্বেচ্ছায় তার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। আলি মর্দান খলজি ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির অধীনতা থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের নাম নেন আলাউদ্দিন আলি মর্দান খলজি। খুব কঠোর শাসক ছিলেন তিনি। তাই তার বিরুদ্ধে ক্রমে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। খলজি মালিকরা একজোট হয়ে বিদ্রোহ করে। তাঁদের হাতে নিহত হন আলি মর্দান খলজি।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি মধ্যযুগের শাসকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার মুসলমান রাজ্যকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। লখনৌতি নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। তাছাড়া ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাই বলা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য এর তিন পাশে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করা হয়। বার্ষিক বন্যার হাত থেকে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ করে সৈন্য ও পণ্য চলাচলের বন্দোবস্ত করেন। এ রাজপথ নির্মাণের ফলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরই শুধু সুবিধা হয়নি; বরং দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদস্বরূপও ছিল। কারণ, তা বার্ষিক বন্যার কবল থেকে তাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করত।

উপরে উল্লিখিত কার্যাবলি গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজিকে একজন সুশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি রাজ্য বিস্তারের দিকেও মনোনিবেশ করেন। পার্শ্ববর্তী কামরূপ, উড়িষ্যা, বঙ্গ (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) এবং ত্রিহুতের রাজারা তাঁর নিকট কর পাঠাতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ মনে করেন আব্বাসীয় খলিফা আল-নাসিরের নিকট থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি স্বীকৃতিপত্র লাভ করেছিলেন। যদিও এ বিষয়টির সপক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে তিনি তার মুদ্রায় বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার নাম অঙ্কন করে ছিলেন।

দিল্লির মুসলমান সুলতান ইলতুৎমিশ অপর মুসলমান সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির অধীনে লখনৌতির (বাংলা) মুসলমান রাজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার কখনও ভালো চোখে দেখেননি। কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভে আশু বিপদ ও সমস্যার সমাধান করার পূর্বে বাংলার দিকে নজর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিপদসমূহ দূর হলে সুলতান ইলতুৎমিশ বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন। ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঙ্গের কিংবা শকরিগলি গিরিপর্বতের নিকট উভয় দলের সৈন্য মুখোমুখি হলে ইওজ খলজি সন্ধির প্রস্তাব করেন। উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। ইলতুৎমিশ খুশি হয়ে মালিক আলাউদ্দিন জানিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ইওজ খলজিকে বঙ্গের শাসক পদে বহাল রেখে দিল্লিতে ফিরে যান। কিন্তু সুলতান দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইওজ খলজি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিহার আক্রমণ করে সেখানকার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন জানিকে বিতাড়ন করা হয়।

ইওজ খলজি লখনৌতি ফিরে এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইলতুৎমিশ আবার বাংলা আক্রমণ করবেন। তিনি প্রায় এক বছরকাল প্রস্তুতি নিয়ে রাজধানীতে অবস্থান করেন এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করেন। এ সময় দিল্লির রাজকীয় বাহিনী অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইওজ খলজি মনে করলেন এ অবস্থায় দিল্লির মুসলমান রাজকীয় বাহিনীর পক্ষে বাংলা আক্রমণ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি এ অবসরে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করার মনস্থ করেন। রাজধানী লখনৌতি একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এদিকে, সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে লখনৌতি আক্রমণের নির্দেশ দেন। ইওজ খলজির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ বঙ্গের রাজধানী লখনৌতি আক্রমণ করেন। এ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইওজ খলজি অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। দিল্লির মুসলমান বাহিনী পূর্বেই তাঁর বসনকোট দুর্গ অধিকার করেছিল। যুদ্ধে বাংলার মুসলমান সুলতান ইওজ খলজি পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইওজ খলজির পরাজয় ও পতনের ফলে বঙ্গদেশ পুরোপুরিভাবে দিল্লির মুসলমান সুলতানের অধিকারে আসে। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ইওজ খলজি শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ের জুমা মসজিদ এবং আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর আমলে পারস্য থেকে বহু সুফি ও সুধীগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁদের আগমন ও ইওজ খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি অভিজাত মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লির মুসলমান শাসকদের একটি প্রদেশে পরিগণিত হয়। এ সময় পনেরো জন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। তাঁদের দশজন ছিলেন দাস। দাসদের আরবি ভাষায় 'মামলুক' বলা হয়। এ কারণে ষাট বছরের বাংলার শাসনকে অনেকে দাস শাসন বা মামলুক শাসন বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এ যুগের পনেরোজন শাসকের সকলেই তুর্কি বংশের ছিলেন। তুর্কি শাসকদের সময়ে দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলছিল। সুতরাং বাংলার মতো দূরবর্তী প্রদেশের দিকে সুলতানদের মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল না। পরিণামে বাংলার তুর্কি শাসকরা অনেকটা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের ইতিহাস

দিল্লির মুসলমান সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই'শ বছর বাংলাকে তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেননি। প্রথমদিকে দিল্লির সুলতানের সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। চেষ্টা করেছে বাংলাকে নিজের অধিকারে আনার জন্য। অবশেষে সফল হতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাই, এ সময়ে বাংলার মুসলমান সুলতানগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে পেরেছেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মাধ্যমে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতানদের হাতে বাংলা প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে।

স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮ - ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)

দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহপ্রবণ বাংলাকে দিল্লির অধীনে রাখার জন্য বাংলাকে তিনটি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। ইউনিটগুলো হলো লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁ।

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন 'ফখরা' নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ' নাম নিয়ে সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের। দিল্লির সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের পক্ষে এ সময় বাংলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ধীরে ধীরে স্বাধীন অংশের সীমা বিস্তৃত হতে থাকে। পরবর্তী দুই'শ

বছর এ স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

দিল্লির শাসনকর্তাগণ সোনারগাঁয়ের ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সুনজরে দেখেননি। তাই, দিল্লির প্রতিনিধি লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান ও সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন মিলিতভাবে সোনারগাঁ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেনি। কদর খান ফখরুদ্দিনের সৈন্যদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরুদ্দিন নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তাঁর মুদ্রায় খোদিত তারিখ দেখে ধারণা করা যায়, তিনি ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তাঁর রাজসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ তৈরি করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁ টাঁকশাল থেকে ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করা হয়। গাজি শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রায় ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তারিখ পাওয়া যায়। সুতরাং বোঝা যায়, ফখরুদ্দিনপুত্র গাজি শাহ পিতার মৃত্যুর পর সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন এবং ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর রাজত্ব করেন।

একক কাজ :

১. গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজির সঙ্গে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের বিরোধের কারণ চিহ্নিত কর।

২. কে, কখন এবং কীভাবে বাংলার স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন?

ইলিয়াস শাহি বংশ

সোনারগাঁয়ে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ যখন স্বাধীন সুলতান তখন লখনৌতির সিংহাসন দখল করেছিলেন সেখানকার সেনাপতি আলি মুবারক। সিংহাসনে বসে তিনি 'আলাউদ্দিন আলি শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। লখনৌতিতে তিনিও স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। পরে রাজধানী স্থানান্তর করেন পাণ্ডুয়ায় (ফিরোজাবাদ)। আলি শাহ ক্ষমতায় ছিলেন ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর দুধভাই ছিলেন হাজি ইলিয়াস। তিনি আলি শাহকে পরাজিত ও নিহত করে 'শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ' নাম নিয়ে বাংলায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের নাম ইলিয়াস শাহি বংশ। এরপর ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ অনেক দিন বাংলা শাসন করেন। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য রাজা গণেশের রাজত্বের উত্থান ঘটেছিল।

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকারের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। সোনারগাঁ ও সাতগাঁও তখনও তাঁর শাসনের বাইরে ছিল। ইলিয়াস শাহের স্বপ্ন ছিল সমগ্র বাংলার অধিপতি হওয়া। তিনি প্রথম দৃষ্টি দেন বাংলার পশ্চিম দিকে। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সাতগাঁও তাঁর অধিকারে আসে। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন। এ সময় তিনি ত্রিহুত বা উত্তর বিহারের কিছু অংশে জয় করে বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন। উড়িষ্যাও তাঁর অধিকারে আসে। তবে ইলিয়াস শাহের সাফল্য ছিল বাংলার পূর্ব দিকের কিছু অংশ দখল করা।

ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে ইলিয়াস শাহের হাতে পরাজিত হন। সোনারগাঁ দখলের মাধ্যমে সমগ্র বাংলার অধিকার সম্পন্ন হয়। তাই বলা হয়, ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলার বাইরেও বিহারের কিছু অংশ– চম্পারণ, গোরক্ষপুর এবং কাশী ইলিয়াস শাহ জয় করেছিলেন। কামরূপের কিছু অংশও তিনি জয় করেন। মোটকথা, তাঁর রাজ্যসীমা আসাম থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

ইলিয়াস শাহ দিল্লির মুসলমান শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করায় সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

প্রথম দিকে দিল্লির সুলতান বাংলার এ স্বাধীনতা মেনে নেননি। সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ থেকে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর চেষ্টা ছিল বাংলাকে দিল্লির মুসলিম অধিকারে নিয়ে আসা। কিন্তু তিনি সফল হননি। ইলিয়াস শাহ দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে বর্ষা এলে জয়ের কোনো সম্ভাবনা না থাকায়, ফিরোজ শাহ সন্ধির মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে ইলিয়াস শাহের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিল্লি ফিরে যান।

শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও জনপ্রিয়। তাঁর শাসনামলে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হাজিপুর নামক একটি শহর তিনি নির্মাণ করেছিলেন। ফিরোজাবাদের বিরাট হাম্মামখানা তিনিই নির্মাণ করেন। এ আমলে স্থাপত্য শিল্প ও সংস্কৃতি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তিনি ফকির-দরবেশদের খুব শ্রদ্ধা করতেন।

ইলিয়াস শাহ লখনৌতির শাসক হিসেবে বঙ্গ অধিকার করলেও গোটা ভূখণ্ডকে একত্রিত করে আঞ্চলিক বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টি করেছিলেন। এ সময় থেকেই বাংলার সকল অংশের অধিবাসী 'বাঙালি' বলে পরিচিত হয়। ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই বাঙ্গালা' ও 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

একক কাজ : সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এর জীবন ও কর্ম মূল্যায়ন কর।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার মতো তিনিও দক্ষ এবং শক্তিশালী শাসক ছিলেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৮ থেকে ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও ফিরোজ শাহ তুঘলককে ব্যর্থ হতে হয়। পিতার মতো সিকান্দার শাহও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী জাফর খানকে সোনারগাঁয়ের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু জাফর খান এ পদ গ্রহণে রাজি হলেন না। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে তিনিও দিল্লিতে ফিরে গেলেন। সোনারগাঁ এবং লখনৌতিতে আবার আগের মতোই সিকান্দার শাহের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রইল। ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিকান্দার শাহ সেভাবেই একে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন। তাঁর ৩৫ বছরের রাজত্বকাল নানা দিক থেকে বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তাঁর স্থাপত্যকীর্তির একটি নিদর্শন।

সুলতান সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন 'আজম শাহ' (১৩৯৩-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ) উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহ যুদ্ধবিগ্রহ ও স্বাধীনতা রক্ষায় নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কৃতিত্ব ছিল অন্যত্র। তিনি তাঁর প্রজারঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে আসামে বিফল অভিযান প্রেরণ করেন। জৌনপুরের রাজা খান জাহানের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। চীনা সম্রাট ইয়াংলো তাঁর দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন মহুয়ান। তিনি য়িং-যাই-শেং-লান, নামে চীনা ভাষায় বাংলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন। তিনিও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে চীনা সম্রাটের নিকট মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মোটকথা, আজম শাহ কোনো যুদ্ধে না জড়ালেও পিতা এবং পিতামহের গড়া বিশাল রাজত্বকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে তাঁর ন্যায় বিচারের কাহিনির বর্ণনা আছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। কবি-সাহিত্যিকগণকে তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কাব্যরসিক ছিলেন এবং বাংলার সুলতান হলেও নিজে ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হতো।

মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বঙ্গের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রাজত্বকালেই শাহ্ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। আজম শাহের রাজত্বকালেই বিখ্যাত সুফি সাধক নূর কুতুব-উল-আলম পাণ্ডুয়ায় আস্তানা গড়ে তোলেন। ফলে পাণ্ডুয়া ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সুলতান মক্কা ও মদিনাতেও মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন বঙ্গের সুলতানদের অন্যতম এবং ইলিয়াস শাহি বংশের শেষ প্রভাবশালী সুলতান। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এ বংশের পতন শুরু হয়। সোনারগাঁয়ে তার সমাধি রয়েছে।

রাজা গণেশ ও হাবসি শাসন

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, বাংলার ইতিহাসের দুই'শ বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলমান সুলতানদের স্বাধীন রাজত্বের যুগ। তথাপি এই দুই'শ বছরের মাঝামাঝি অল্প সময়ের জন্য কিছুটা বিরতি ছিল। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এ সময় অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। তিনি এক বছর শাসন করার পর ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ক্রীতদাস শিহাব উদ্দিনের হাতে নিহত হন। শিহাব উদ্দিন সুলতান হয়ে নিজের নাম নেন 'শিহাব উদ্দিন বায়াজিদ শাহ'। কিন্তু দুই বছরের মাথায় ১৪১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনিও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হন। এ সুযোগে অভিজাতদের মধ্য থেকেই রাজা গণেশ বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

বাংলার সুলতান আজম শাহের একজন উচ্চপদস্থ অমাত্য ছিলেন রাজা গণেশ। জানা যায় গণেশ প্রথমে দিনাজপুরের ভাতুরিয়া অঞ্চলের একজন রাজা ছিলেন। তিনি সুলতানের দরবারে চাকরি নেন। চাকরি নিয়েই তিনি অন্যান্য অভিজাতদের মতোই রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মুসলমানদের মতো রাজসিংহাসনে আরোহণ করা। এ লক্ষ্যেই তিনি ইলিয়াস শাহি বংশ উচ্ছেদ করে নিজে ক্ষমতায় বসেন। এ প্রক্রিয়ায় গণেশ অনেক মানুষকে হত্যা করেন। তার হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-উল-আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট আবেদন জানান। ইব্রাহিম শর্কি সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে গণেশ ভয় পেয়ে যান। অবশেষে, তিনি আপস করেন দরবেশ নূর কুতুব-উল-আলমের সাথে। শর্ত অনুযায়ী গণেশ তাঁর ছেলে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ছেলের হাতে বাংলার সিংহাসন ছেড়ে দেন। মুসলমান হওয়ার পর যদুর নাম হয় জালালউদ্দিন মাহমুদ। সুলতান ইব্রাহিম শর্কি জালালউদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে ফিরে যান নিজ দেশ জৌনপুরে।

গণেশ দুইবার সিংহাসনে বসেছিলেন। প্রথমবার কয়েক মাস মাত্র ক্ষমতায় ছিলেন। ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইব্রাহিম শর্কি জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। ইব্রাহিম শর্কি ফিরে গেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন গণেশ। তখন জালালউদ্দিনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গণেশ ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর হিন্দু অমাত্যগণ গণেশের পুত্র মহেন্দ্রদেবকে বঙ্গে সিংহাসনে বসান। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে গণেশের পুত্র জালালউদ্দিন দ্বিতীয়বার বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি একটানা ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

এ শাসকের সময় বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রায় সমগ্র বাংলা এবং আরাকান ব্যতীত ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন টাকশাল থেকে তাঁর নামে মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। পাণ্ডুয়া থেকে তিনি গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন।

জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ শাহ অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে সাদি খান ও নাসির খান নামক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। এভাবে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের প্রায় ত্রিশ বছরের রাজত্বের অবসান ঘটে।

একক কাজ

১. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রমাণ কর।

২. রাজা গণেশের উত্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহি বংশের শাসন

শামসুদ্দিন আহমদ শাহের মৃত্যুর পর তার অন্যতম হত্যাকারী ক্রীতদাস নাসির খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আহমদ শাহকে হত্যা করার ব্যাপারে যে অভিজাতবর্গ ইন্ধন দেয়, তারা নাসির খানের সিংহাসনে আরোহণকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেনি। সম্ভবত ক্রীতদাসের আধিপত্যকে তারা অপমানজনক মনে করেছিল। তাই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাসির খানকে হত্যা করে।

নাসির খান নিহত হওয়ার পর গৌড়ের সিংহাসন কিছু সময়ের জন্য শূন্য অবস্থায় পড়ে রইল। আহমদ শাহের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। অতঃপর অভিজাতবর্গ মাহমুদ নামে ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে ১৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসায়। ইতিহাসে তিনি নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ এভাবে পুনরায় স্বাধীন রাজত্ব শুরু করেন। তাই এ যুগকে বলা হয় 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহি যুগ'। নাসিরউদ্দিন একজন দক্ষ সেনাপতি ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। যশোর ও খুলনা এলাকায় নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও বিহারের কতকাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন করেছিলেন।

১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার রাজত্বকাল থেকেই বরবক শাহ শাসক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি পায়। গঙ্গা নদীর উত্তরাংশে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগলপুর বরবক শাহের সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে গোলযোগ ছিল। বরবক শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকে এটি আরাকান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। কিন্তু শেষ দিকে বরবক শাহ তা পুনরুদ্ধার করেন। যশোর ও খুলনা তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি দক্ষিণ দিকেও তাঁর রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন।

বরবক শাহই প্রথম অসংখ্য আবিসিনীয় ক্রীতদাস (হাবসি ক্রীতদাস) সংগ্রহ করে সেনাবাহিনী ও রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। নিয়োগকৃত এ হাবসি ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল আট হাজার। তিনি সম্ভবত রাজ্যে একটি নিজস্ব দল গঠনের উদ্দেশ্যে এই হাবসিদের নিয়ে বাহিনী গঠন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ ব্যবস্থা ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহ একজন পণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর নামের পাশে নিজ নামে এবং বিভিন্ন রাজকীয় 'আল-ফাজিল' ও 'আল-কামিল' এ দুই উপাধির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বরবক শাহ শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি শুধু পণ্ডিতই

ছিলেন না, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি যে একজন উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনের নরপতি ছিলেন তা হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা ও বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যায়। প্রাচীনকালে এই একইভাবে বৌদ্ধরা হিন্দুদের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধরা রাজপদে নিয়োগ করতেন। যাহোক, বরবক শাহের মতো মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন শাসক শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে কমই দেখা গেছে।

বরবক শাহ একজন প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক ছিলেন। গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' নামে পরিচিত বিরাট ও সুন্দর তোরণটি বরবক শাহই নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ আমলে চট্টগ্রাম এবং পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জে দুইটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত কার্যক্রম বিবেচনা করলে বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে বরবক শাহকে অন্যতম বলা যায়।

১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বরবক শাহ পরলোকগমন করেন। পরে তাঁর পুত্র সামসুদ্দিন আবু মুজাফফর ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুলতান হন। পিতা ও পিতামহের গড়া বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সময় অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পূর্বে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে অপসারণ করা হয়। বরবক শাহের ছোট ভাই হুসাইন 'জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ সময় রাজদরবারে দুর্যোগ দেখা দেয়। হাবসি ক্রীতদাসরা এ সময় খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিপত্তি কমানোর জন্য জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ চেষ্টা করেন। এতে সমস্ত হাবসি ক্রীতদাস একজোট হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সুলতান শাহজাদা ছিলেন প্রাসাদরক্ষী দলের প্রধান। ক্রীতদাসরা প্রলোভন দ্বারা সুলতান শাহজাদা ও তার অধীনস্থ পাইকদের নিজ দলভুক্ত করে। শাহজাদা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ফতেহ শাহকে হত্যা করেন। ফতেহ শাহ নিহত হলে বাংলার সিংহাসনে ইলিয়াস শাহি বংশের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলায় হাবসিদের রাজত্বের সূচনা হয়।

একক কাজ : সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কোন পদক্ষেপ মানুষের জন্য হিতকর ছিল তা অনুসন্ধান কর।

হাবসি শাসন

বাংলায় হাবসি শাসন মাত্র ছয় বছর (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) স্থায়ী ছিল। এ সময় বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস ছিল অন্যায়, অবিচার, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র আর হতাশায় পরিপূর্ণ। এ সময়ে চারজন হাবসি সুলতানের মধ্যে সবাইকে হত্যা করা হয়।

হাবসি নেতা সুলতান শাহজাদা 'বরবক শাহ' উপাধি নিয়ে প্রথম বাংলার ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি হাবসি সেনাপতি মালিক আন্দিলের হাতে নিহত হন। মালিক আন্দিল 'সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। একমাত্র তাঁর তিন বছরের রাজত্বকালের (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ইতিহাসই কিছুটা গৌরবময় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ। কিন্তু কিছুকাল (১৪৯০-১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করার পরই তিনি নিহত হন। এক হাবসি সর্দার তাঁকে হত্যা করে 'শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ' নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)। অন্যান্য অনেক সুলতানের মতোই অত্যাচারী ও হত্যাকারী হিসেবে তার দুর্নাম ছিল। ফলে গৌড়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন মুজাফফর শাহের উজির সৈয়দ হোসেন। অবশেষে মুজাফফর শাহ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় হাবসি শাসনের অবসান ঘটে।

হুসেন শাহি বংশ

হাবসি শাসন উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন সৈয়দ হুসেন। সুলতান হয়ে তিনি 'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবেই বাংলায় 'হুসেন শাহি বংশ' নামে এক নতুন বংশের শাসনপর্ব শুরু হয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহি আমল (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি যুগের প্রধান সুলতান। পিতা সৈয়দ আশরাফ-আল-হুসাইনি ও ভাই ইউসুফের সাথে তিনি তুর্কিস্তানের তিরমিজ শহর থেকে বাংলায় আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া গ্রামে প্রথমে বসবাস শুরু করেন। হুসেন শাহ পরে রাজধানী গৌড়ে যান এবং মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরি লাভ করেন। পরে তিনি উজির হন। এভাবেই তিনি বাংলার ক্ষমতায় আসেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন জাতিতে আরব। ঐতিহাসিক ফিরিশতা ও গোলাম হোসেন সলিম তাকে 'সৈয়দ' বলে উল্লেখ করেন। তার সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। হাবসি গোষ্ঠীভুক্ত একদল মুসলমানের দুঃশাসনের ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি সুলতানের হত্যার পেছনে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করত। সিংহাসন লাভের পর হুসেন শাহ হাবসিদের এরূপ কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর আদেশ অমান্য করলে তিনি তাদের হত্যার আদেশ দেন। হুসেন শাহের এ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রায় বারো হাজার হাবসি প্রাণ হারায় এবং বাকি হাবসিদেরকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতার বিনাশ। এ পাইক বাহিনী রাজপ্রাসাদের সকল ষড়যন্ত্রের মূলে কাজ করত। হুসেন শাহ পাইকদের দল ভেঙে দেন। তাদের জায়গায় সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুদের নিয়ে তিনি একটি নতুন রক্ষীদল গঠন করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নিজ ক্ষমতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলার রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে হাবসিদের প্রভাবমুক্ত করতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি রাজধানী পরিবর্তন করে শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। গৌড় রাজ্যের নিকটবর্তী একডালাতে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই পাণ্ডুয়া বা গৌড় ব্যতীত অন্যত্র রাজধানী স্থাপন করেন। হাবসি শাসনকালে গোলযোগ সৃষ্টিকারী আমির-ওমরাহদের কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়। নিচ বংশজাত অত্যাচারী সকল কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। তার পরিবর্তে তিনি শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদে সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান, হিন্দুদের নিযুক্ত করেন। এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশও তার করায়ত্ত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশও তার অধিকারে আসে।

তিনি আরাকানিদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়ন করেন। এ সময়ে দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি বাংলা আক্রমণ করলে তিনি তা প্রতিহত করেন। একমাত্র আসাম অভিযানে তিনি সফল হতে পারেননি। বিশাল রাজ্যে সব রকম নিরাপত্তা বিধানে হুসেন শাহ সফল হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। এ সুদীর্ঘ সময় সাফল্যের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

একজন শাসক হিসেবে হোসেন শাহ নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজার জন্য রাজ্য

জয়ই শেষ কথা নয়, যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও যে অপরিহার্য তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনা ও প্রজাপালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষ্য। এজন্য একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদের বিভিন্ন উপাধিও প্রদান করতেন। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের এ উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু হয়েছিল এবং বাঙালিদের নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। এটি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় বহন করে। হুসেন শাহের এ ধর্মীয় উদারতা তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও উৎসাহিত করেছিল। তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত।

হুসেন শাহের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। তাঁর শাসনকালেই আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক, ভক্তি আন্দোলনের নেতা, মানবতাবাদী শ্রীচৈতন্য দেবের। হুসেন শাহ তাঁর প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁকে ধর্ম প্রচারে সব রকম সহায়তা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সত্যপীরের আরাধনা হুসেন শাহের শাসনকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সত্যপীরের আরাধনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা।

চিত্র-২৬ : শ্রীচৈতন্য

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি সাধন করেছে। হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন। এ যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, পরাগল খান ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের নিরলস সাহিত্য-কীর্তি বাংলার সাহিত্যভাণ্ডার ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভগবদ্' ও 'পুরাণ' এবং পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ আরবি ও ফার্সি ভাষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সকল ধর্মের মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল আলাউদ্দিন হুসেন শাহের। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত মসজিদের মধ্যে গৌড়ের 'ছোট সোনামসজিদ' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকগুলি খানকাহ্ ও মাদ্রাসাও নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডুয়ার মুসলমান সাধক কুতুব-উল-আলমের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুসেন শাহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্যপ্রীতির পরিচয় বহন করে। তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান

ও শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এজন্য তাঁর শাসনকালকে অনেকেই বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যাত করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নুসরত শাহ 'নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফফর নুসরত শাহ' (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ) উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তার শাসন কাজে যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখে হুসেন শাহ তার রাজত্বকালেই শাসনকার্যের কিছু কিছু ক্ষমতা নুসরত শাহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সিংহাসনে বসে তিনি পিতার মতো রাজক্ষমতা অব্যাহত রাখেন। এ সময় সমগ্র বিহার তাঁর অধীনে আসে। তাঁর সময়ে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর বাংলা দখলের জন্য সৈন্য পাঠান। নুসরত শাহ প্রথমে বাবরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। পরে যুদ্ধ শুরু হলে সন্ধি করে বাংলায় তার ক্ষমতাকে নিরাপদ রাখেন। ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে নুসরত শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হন।

পিতার মতোই সুলতান নুসরত শাহ তাঁর সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। জনগণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল এবং সহৃদয়। প্রজাদের পানি কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি রাজ্যের বহু স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেছিলেন বলে জানা যায়। বাগেরহাটের 'মিঠাপুকুর' আজও তাঁর কীর্তি বহন করছে। নুসরত শাহের মানবিক গুণাবলি তাকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেছিল। হাজার বছরে বিরাজমান ধর্মীয় সম্প্রীতি এ সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

নুসরত শাহের শাসনকালের বহু স্থাপত্য-কীর্তি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার বাদুস্থারী পরিচয় বহন করে। গৌড়ের বিখ্যাত 'কদম রসুল' ভবনের প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন। তাঁর উপর হযরত মুহম্মদের (সা.) পদচিহ্ন সংবলিত একটি কালো কারুকার্য খচিত মর্মর বেদি বসানো হয়। গৌড়ের মসজিদ বিখ্যাত 'বড় সোনা মসজিদ' বা 'বারোদুয়ারি মসজিদ' তাঁর আমলের কীর্তি। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগর এবং রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে তিনি দুইটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কার্যসমূহের আর একটি নিদর্শন হলো সাদুল্লাপুরে আউলিয়া মখদুম আখি সিরাজউদ্দিনের মাজারের ভিত্তি স্থাপন।

নুসরত শাহের আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন বিশিষ্ট বাঙালি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর শাসনকালেই শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীধরও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের জন্য নুসরত শাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে লাইব্রেরিও স্থাপন করেছিলেন।

বাংলার পরবর্তী সুলতান ছিলেন নুসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি প্রায় এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন। নুসরত শাহের সময় থেকেই অহোম রাজ্যের সাথে বাংলার সংঘর্ষ চলছিল। ফিরোজ শাহের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। নুসরত শাহের সময়কাল থেকেই শুরু হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের পতন পর্ব। নুসরত শাহের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন দুর্বল। তাঁর ছোট ভাই গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু, তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং নুসরত শাহের শাসনকালে রাজ্যে যে ভাঙনের সূচনা হয়েছিল, মাহমুদ শাহের শাসনকালে তা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আফগান যোদ্ধা শেরশাহ শূরের সাথে সংঘর্ষ। অবশেষে ১৫৩৮ সালে শেরশাহ গৌড় দখল করলে কেবল হুসেন শাহী বংশের নয়, বরং বাংলার দুই'শ বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে।

একক কাজ : শাসন-নীতির ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের উদারতা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে এনেছিল-এ কথার যথার্থতা নিরূপণ কর।
দলীয় কাজ : সুলতান নুসরত শাহের রাজত্বকালের জনহিতকর কার্যাবলি ও স্থাপত্য কীর্তিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

আফগান শাসন ও বারোভূঁইয়া (১৫৩৮-১৫৭৬ সাল)

১৫৩৮ সালে আরব এবং পারস্যের অভিজাত মুসলমানদের হাতে প্রতিষ্ঠিত বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান হলে বাংলাকে একে একে অন্যান্য বিদেশি শক্তিসমূহ গ্রাস করতে থাকে। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন অল্প কিছুকাল বাংলার রাজধানীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আফগান নেতা শের শাহের কাছে পরাজয় মানতে হয়। বাংলা ও বিহার সরাসরি চলে আসে আফগানদের নিয়ন্ত্রণে। আফগানদের দুই শাখা—শূর আফগান ও কররানি আফগানরা বেশ কিছুকাল বাংলা শাসন করেন। শেষ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট আকবর আফগানদের হাত থেকে বাংলার ক্ষমতা কেড়ে নেন। অবশ্য রাজধানী দখল করলেও মুঘলরা বাংলার অভ্যন্তরে অনেক দিন পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। এ সময় বাংলায় অনেক বড় বড় স্বাধীন জমিদার ছিলেন। 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত এ সকল জমিদার মুঘলদের অধিকার মেনে নেননি। সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সুবাদারগণ 'বারোভূঁইয়া'দের দমন করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। 'বারোভূঁইয়া'দের দমন করা হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে।

আফগান শাসন

মুঘল সম্রাট বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুন হুসেন শাহি যুগের শেষ দিক থেকেই চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে মুঘল অধিকারে নিয়ে আসতে। কিন্তু আফগানদের কারণে মুঘলদের এ উদ্দেশ্য প্রথম দিকে সফল হয়নি। আফগান নেতা শের খান শূরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সম্রাট হুমায়ুন। শের খানের পিতা হাসান খান শূর বিহারে অবস্থিত সাসারাম এলাকার জায়গিরদার ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জায়গিরদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ সময় বিহারের জায়গিরদার জালাল খান নাবালক বলে তাঁর অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শের খান।

সমগ্র ভারতের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ছিল শের খানের। তাই গোপনে তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এ লক্ষ্যে অল্প সময়ের মধ্যে শের খান শক্তিশালী চুনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করেন। তিনি ১৫৩৭ সালে দুইবার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এবার সতর্ক হন দিল্লির মুঘল সম্রাট হুমায়ুন। তিনি শের খানের পিছু ধাওয়া করে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে নেন। গৌড়ের চমৎকার প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন এর নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'। সম্রাট গৌড়ে ৬ মাস আমোদ-ফুর্তিতে গা ভাসিয়ে দেন। এ সুযোগে নিজের শক্তি বাড়াতে থাকেন শের খান। দিল্লি থেকে খবর আসে হুমায়ুনের সৎভাই হিন্দাল সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ুন দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। এ সুযোগ কাজে লাগান শের খান। তিনি ওত পেতে থাকেন বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে। গঙ্গা নদীর তীরে এ স্থানে হুমায়ুন পৌঁছালে শের খান তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রস্তুত হুমায়ুন পরাজিত হন (১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শেরশাহ' উপাধি নেন। তিনি নিজেকে বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। এবার বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন তিনি। ১৫৪০ সালে মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলিকে পরাজিত করে তিনি বাংলা দখল করেন। এ বছরই তিনি হুমায়ুনকে কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। এভাবে দীর্ঘদিন পর বাংলা আবার দিল্লির শাসনে চলে আসে। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলা অঞ্চল শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শেরশাহ আফগান শূর বংশের ছিলেন বলে এ সময়ের বাংলার শাসন ছিল শূর আফগান বংশের শাসন।

১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান 'ইসলাম খান' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আট বছর (১৫৪৫-১৫৫৩ সাল) রাজত্ব করেন। কিন্তু ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ খানের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে শূর বংশের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শের খানের ভাগ্নে মুবারিজ খান ফিরোজ খানকে হত্যা করে 'মুহম্মদ আদিল' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলি থেকে এ সময় বাংলা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই ইসলাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার আফগান শাসক মুহম্মদ খান শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উপাধি ধারণ করেন 'মুহম্মদ শাহ শূর'। এ সময় থেকে পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন ছিল। মুহম্মদ শাহ শূর উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ শূরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি জৌনপুর জয় করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

মুহম্মদ শাহ শূর নিহত হলে দিল্লির সুলতান আদিল শাহ শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ শাহের পুত্র খিজির খান তখন এলাহাবাদে অবস্থান করছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ' উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। কিছুদিন পর তিনি শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

এ সময় দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। শের শাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু দিল্লিতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেলেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে শূর বংশীয় আফগান নেতৃবৃন্দকে একে একে পরাজিত করার জন্য অগ্রসর হলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ সাল) আদিল শাহের সেনাপতি হিমু মুঘল সৈন্যদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। এতে আদিল শাহ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বাংলার দিকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে সুরজগড়ের নিকটবর্তী ফতেহপুরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ কর্তৃক এক যুদ্ধে ১৫৫৭ সালে আদিল শাহ পরাজিত ও নিহত হন।

বাংলা বিজয়ী আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হলে মুঘল সেনাপতি খান-ই-জামান তাঁর গতিরোধ করেন। কূটকুশলী বাহাদুর শাহ খান-ই-জামানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি বাংলার বাইরে আর কোনো অভিযান চালাননি। ১৫৬০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জালালউদ্দিন শূর 'দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও তাঁর ভ্রাতার ন্যায় মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন। ১৫৬৩ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর নাম জানা যায়নি। মাত্র সাত মাস রাজত্ব করার পর তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন নামে জনৈক আফগান দলনেতা তাঁকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তিনিও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। কররানি বংশের তাজ খান কররানি গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাজ খান কররানি ও সুলায়মান খান কররানি শের শাহের সেনাপতি ছিলেন। কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শের শাহ তাদের দক্ষিণ বিহারে জায়গির প্রদান করেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান কররানি সেনাপতি ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম

শাহের বালকপুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরোজের সময় তাজ খান উজির নিযুক্ত হন। ফিরোজকে হত্যা করে তাঁর মামা মুহম্মদ আদিল শূর সিংহাসনে বসেন। এ সময় তাজ খান কররানি পালিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের সহায়তায় দক্ষিণ বিহারে প্রাধান্য স্থাপন করেন। ১৫৫৭ সালে তাজ খান কররানি নামমাত্র বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ শূরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে পড়েন।

বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি সুযোগের অন্বেষণে ছিলেন। অজ্ঞাতনামা গিয়াসউদ্দিন যখন শূর বংশের সিংহাসন দখল করেন, তখন সুযোগ বুঝে তাজ খান ও তাঁর ভ্রাতারা গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড় দখল করেন। এভাবে তাজ খান কররানি বাংলায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত শাসনামল বাংলার ইতিহাসে আফগান 'কররানি' শাসনামল বলে পরিচিত।

তাজ খান কররানির মৃত্যুর পর ১৫৬৫ সালে তাঁর ভাই সুলায়মান খান কররানি বাংলার সুলতান হন। এ দক্ষ শাসক আফগান নেতাদের তাঁর দলভুক্ত করেন। এভাবে বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ এলাকা তাঁর অধিভুক্ত হয়। উড়িষ্যাতেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলায়মান কররানি তাঁর বিজ্ঞ উজির লোদি খানের পরামর্শে মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম গৌড় থেকে মালদহের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১৫৭২ সালে সুলায়মান কররানির মৃত্যু হলে পুত্র বায়জিদ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই আফগান সর্দাররা এ অত্যাচারী সুলতানকে হত্যা করেন। এবার সিংহাসনে বসেন সুলায়মান কররানির দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানি। তিনিই ছিলেন বাংলায় শেষ আফগান শাসক। দাউদ কররানি খুব অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। বিশাল রাজ্য ও ধন ঐশ্বর্য দেখে তিনি নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে থাকেন। এতদিন বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকগণ প্রকাশ্যে মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। কিন্তু দাউদ স্বাধীন সম্রাটের মতো 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজ নামে খুতবা পাঠ করেন ও মুদ্রা প্রচলন করেন।

আফগানরা এমনিতেই মুঘলদের শত্রু ছিল। তার ওপর বাংলা-বিহার মুঘলদের অধিকারে না থাকায় সম্রাট আকবরের স্বস্তি ছিল না। দাউদ কররানির স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে আকবর ক্ষুব্ধ হন। প্রথমে আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দেন কররানি রাজ্য আক্রমণ করতে। প্রথম দিকে সরাসরি আক্রমণ করেননি মুনিম খান। উজির লোদি খানের সাথে মুনিম খানের বন্ধুত্ব ছিল। দাউদ খান কররানি তাঁর উজির লোদির পরামর্শে মুনিম খানের সাথে ধনরত্ন দিয়ে আপস করেন। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। দাউদ খান কিছু ষড়যন্ত্রকারীর পরামর্শে ভুল বোঝেন উজির লোদিকে। দাউদ খানের নির্দেশে হত্যা করা হয় তাঁকে। লোদির বুদ্ধি আর বন্ধুত্বের গুণেই এতদিন মুঘল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল বাংলা ও বিহার। তাঁর অনুপস্থিতিতে মুনিম খানের বাংলা ও বিহার আক্রমণে আর বাধা রইল না। মুনিম খান তার বন্ধু লোদির মৃত্যুর পর ১৫৭৩ সালে বিহার থেকে আফগানদের হটিয়ে দেন।

আফগানরা ইতোমধ্যে নিজেদের ভেতর বিবাদ করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে মুনিম খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কররানিদের বাংলার রাজধানী ছিল তাণ্ডায়। আফগানরা বাংলার রাজধানী তাণ্ডা ছেড়ে পিছু হটে আশ্রয় নেয় হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে। মুনিম খানের নেতৃত্বে রাজধানী অধিকার করে মুঘল সৈন্যরা ও অগ্রসর হয় সপ্তগ্রামে। দাউদ খান পালিয়ে যান উড়িষ্যায়। মুনিম খান তাণ্ডায় বাংলার মুঘল প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তাণ্ডায় প্লেগ রোগ দেখা দিলে মুনিম খানসহ অনেক মুঘল সৈন্য এ রোগে মারা যান। ফলে বাংলায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থার সুযোগে দাউদ কররানি পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরায় অধিকার করে নেন। অন্যদিকে ভাটি অঞ্চলের জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা থেকে মুঘল সৈন্যদের হটিয়ে দেন। মুঘল সৈন্যরা এবার বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নেয়।

মুনিম খানের মৃত্যুসংবাদ আগ্রায় পৌঁছালে সম্রাট আকবর বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান খানজাহান হুসেন কুলি খানকে। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন রাজা টোডরমল। বাংলায় প্রবেশপথে রাজমহলে মুঘল সৈন্যদের বাধা দেন দাউদ কররানি। মুঘলদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে বাংলায় আফগান কররানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়। অবশ্য 'বারোভূঁইয়া'দের বাধার মুখে মুঘল শাসন বেশি দূর বিস্তৃত হতে পারেনি।

একক কাজ : বাংলায় আফগান শাসন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা কর।

বারোভূঁইয়াদের ইতিহাস

সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদার মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাঁদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত। এ 'বারো' বলতে বারোজনের সংখ্যা বোঝায় না। ধারণা করা হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক বড় বড় 'ভূঁইয়া' বা জমিদারদের বোঝাতেই 'বড়' থেকে 'বারো' শব্দটি প্রচলিত হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে বারোভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোলো শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। আলোচ্য সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁরাই 'বারোভূঁইয়া'। এছাড়াও, বঙ্গদেশে আরও অনেক ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। তাঁরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। কিন্তু পরে তাঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। বারোভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

বারোভূঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম
ঈসা খান, মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশে, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশে।
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
বাহাদুর গাজি	ভাওয়াল
সোনা গাজি	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)
ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)
বীর হাম্বির	বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)
লক্ষণ মাণিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বিনোদ রায়, মধু রায়	চান্দপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশবিশেষ

প্রথম দিকে বারোভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান। হুসেন শাহি বংশের অবসান হলে ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান সোনারগাঁ অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। খিজিরপুর দুর্গ ছিল তাঁর শক্তির প্রধান কেন্দ্র। সোনারগাঁ ও খিজিরপুরের নিকটবর্তী কাত্রাবু তাঁর রাজধানী ছিল। দাউদ কররানির পতনের পর তিনি সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করেন।

বারোভূঁইয়াদের দমন করার জন্য সম্রাট আকবর বিশেষ মনোযোগ দেন। এজন্য তিনি ১৫৮৩ সালে শাহবাজ খান, ১৫৮৫ সালে সাদিক খান, ১৫৮৬ সালে উজির খান ও ১৫৯৪ সালে রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। তাঁরা ঈসা খান ও অন্যান্য জমিদারের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেন। কিন্তু বারোভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খানকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। তিনি সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে নিজের আধিপত্য বজায় রাখেন। অন্যদিকে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

১৫৯৯ সালে ঈসা খানের মৃত্যু হলে বারোভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসা খান। এদিকে ১৬০১ সালে মানসিংহকে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় পাঠানো হয়। এবার মানসিংহ কিছুটা সফল হন। ১৬০৩ সালে মুসা খান এক নৌযুদ্ধে মানসিংহের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার আগে সম্রাট আকবরের অসুস্থতার খবর আসে। সম্রাটের ডাকে মানসিংহ আগ্রায় ফিরে যান।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে ১৬০৫ সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মানসিংহকে আবার বাংলায় প্রেরণ করেন। এক বছর পর ১৬০৬ সালে কুতুব উদ্দিন কোকাকে বাংলার প্রাদেশিক শাসক বা সুবাদার নিয়োগ করা হয়। কুতুব উদ্দিন শের আফকুনের হাতে প্রাণ হারান। তাঁর পরবর্তী সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খান এক বছর পর মারা যান। এর পর ইসলাম খান ১৬০৮ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

বাংলার বারোভূঁইয়াদের পরাজিত করে এদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। আর এ কৃতিত্বের দাবিদার সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ সালে)। শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি বুঝতে পারেন যে, বারোভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানকে পরাজিত করতে পারলেই তাঁর পক্ষে অন্যান্য জমিদারকে বশীভূত করা সহজ হবে। সেজন্য তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ মুসা খানের ঘাঁটি সোনারগাঁ ঢাকার অদূরে ছিল। বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আসার পথে ইসলাম খান কয়েকজন জমিদারের আনুগত্য লাভ করেছিলেন।

বারোভূঁইয়াদের মোকাবিলা করার জন্য ইসলাম খান শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন। মুসা খানের সাথে প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১৬০৯ সালে করতোয়া নদীর পূর্বতীরে যাত্রাপুরে। সেখানে মুসা খানের দুর্গ ছিল। যুদ্ধে মুসা খান ও অন্যান্য জমিদার শেষ পর্যন্ত পিছু হটেন। ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় থেকে ঢাকা হয় বাংলার রাজধানী। সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম রাখা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর'।

এরপর পুনরায় মুসা খানের নেতৃত্বে মুঘলদের বাধা দেওয়ার জন্য জমিদারদের নৌবহর একত্রিত হয় শীতলক্ষ্যা নদীতে। ইসলাম খান এর পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও নৌবহর প্রেরণ করেন। ১৬১১ সালে ইসলাম খানের সঙ্গে জমিদারদের যুদ্ধ শুরু হয়। নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত মুসা খানের কদম রসুল দুর্গসহ অন্যান্য দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আসে। অবস্থার বিপর্যয়ে মুসা খান সোনারগাঁ চলে আসেন। রাজধানী নিরাপদ নয় মনে করে তিনি মেঘনা নদীতে অবস্থিত ইব্রাহিমপুর দ্বীপে আশ্রয় নেন। মুঘল সৈন্যরা সোনারগাঁ অধিকার করে নেন। এর ফলে জমিদারগণ বাধ্য হন আত্মসমর্পণ করতে। কোনো উপায় না দেখে মুসা খানও শেষ পর্যন্ত মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ইসলাম খান মুসা খানকে অন্যান্য জমিদারদের মতো মুঘলদের অধীনস্থ জায়গিরের দায়িত্ব দিলেন। এরপর মুসা খান সম্রাটের অনুগত জায়গিরদার হিসেবে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। মুসা খানের আত্মসমর্পণে অন্যান্য জমিদার নিরাশ হয়ে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। এভাবে বাংলায় বারোভূঁইয়াদের শাসনের অবসান ঘটে।

জোড়ায় কাজ : ১. নিচের ছকে প্রদত্ত 'বারোভূঁইয়া'দের নাম ও সঠিক অঞ্চল মিল কর (৫টি) :

ক্রমিক নং	বারোভূঁইয়াদের নাম	অঞ্চল
১	ঈসা খান, মুসা খান	ভাওয়াল
২	চাঁদ রায় ও কেদার রায়	ভূষণা (ফরিদপুর)
৩	বাহাদুর গাজী	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
৪	লক্ষণমাণিক্য	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
৫	মুকুন্দরাম সত্রাজিৎ	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ।

২. ঢাকার নাম কীভাবে 'জাহাঙ্গীরনগর' হয়েছিল অনুসন্ধান কর।
৩. রাজমহল থেকে সুবাদার ইসলাম খানের ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের কারণ অনুসন্ধান কর।

বাংলায় মুঘল শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ সাল)

সুবাদারি ও নবাবি–এ দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। বারোভূঁইয়াদের পরাজিত করার পর সমগ্র বাংলা অঞ্চলে মুঘল সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। সতেরো শতকের প্রথম দিক থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মুঘল আমলের এই যুগ 'নবাবি আমল' নামে পরিচিত।

সুবাদারি শাসনামল

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে বারোভূঁইয়াদের পরাজিত করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে ১৬৬০ সালে সুবাদার মীর জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে ইসলাম খান চিশতি (১৬১৭-১৬২৪ সাল) এবং দিল্লির সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭-১৬২৪ সাল) বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর খুব অল্প সময়ের জন্য সুবাদার নিযুক্ত হন দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান এবং ফিতাই খান।

সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বাংলার সুবাদার হিসেবে কাসিম খান জুয়িনীকে নিয়োগ করেন ১৬২৮ সালে। হুসেন শাহি যুগ থেকেই বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করত। এ সময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

কাসিম খানের পর সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদি (১৬৩৫-১৬৩৯ সাল) চার বছর শাসন করেন। অতঃপর সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুজা বিশ বছর দায়িত্বে ছিলেন। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল সুজার শাসনকাল। বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেকেই সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করেন। এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ সালে শাহ সুজা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে তিনি আরাকান গমন করেন। সেখানে পরে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা সুজাকে দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে (১৬৬০-১৬৬৩ সাল) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। কুচবিহার এবং আসাম বিজয় মীর জুমলার সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর সময়েই কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে প্রথমবারের মতো মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আসাম অভিযানের দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসাম পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

শায়েস্তা খান

মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। ১৬৬৪ সালে আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

চিত্র-২৭ : শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান ইতিহাসে একজন দক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক হিসেবে পরিচিত। তিনি মগদের উৎপাত থেকে বাংলার জনগণের জান-মাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি এলাকায়ও মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে সাহস পাননি। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাধে। ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে খান-ই-জাহান বাহাদুর, ইব্রাহিম খান ও আজিমুদ্দিন বাংলার সুবাদার হন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবহুল ছিল না।

শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে, তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন।

শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, বিবি পরির মাজার, হোসেনী দালান, সফি খানের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের মতো নিজের স্মৃতিকে এত বেশি নবাবি আমলে রেখে যেতে পারেননি। বস্তুত ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী।

নবাবি আমল

নবাব মুর্শিদ কুলি খান

১৭০০ সালে বাংলায় আসেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি ১৭২৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। প্রথমে তাঁকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দেওয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলি খান যখন বাংলায় আগমন করেন, তখন বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতির মুখে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলায় মুঘল শাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তিনি বাংলার ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করেছিলেন।

চিত্র-২৮ : মুর্শিদ কুলি খান

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে,এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদ কুলি খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়েন। তিনি সম্রাটের নামমাত্র আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। তিনি ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন, সম্রাটের অনুমোদনক্রমে এর নামকরণ করা হয় 'মুর্শিদাবাদ'। এভাবে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়।

নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকেই বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। এ সময় সুবাকে বলা হতো 'নিজামত' আর সুবাদারের বদলে পদবি হয় 'নাজিম'। নাজিম পদটি হয়ে পড়ে বংশগত। সুবাদার বা নাজিমগণ বাংলার সিংহাসনে বসে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে শুধু একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। তাই আঠারো শতকের বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমলরূপে পরিচিত। আর প্রায় স্বাধীন শাসকগণ পরিচিত হন 'নবাব' হিসেবে।

রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদ কুলি খানের সর্বাধিক আলোচিত কীর্তি। তিনি ভূমি জরিপ করে রায়তদের সামর্থ্য অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। রাজস্ব আদায়কে নিশ্চিত ও নিয়মিত করার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সাহায্যে ভূমির প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তি ও বাণিজ্য করের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রজাদের হয়রানির কোনো সুযোগ ছিল না।

মুর্শিদ কুলি খান দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রসারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলায় একটি নতুন ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। তার প্রবর্তিত এ ব্যবস্থাটি 'মালজামিনি' প্রথা নামে পরিচিত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইংরেজ, ফরাসি ও পারসিক ব্যবসায়ীদের তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। ব্যবসায়ীরা যাতে নির্দিষ্ট হারে প্রচলিত কর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি যাতে কোনো অবিচার করা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতা, চুঁচুড়া ও চন্দননগর বিভিন্ন বিদেশি বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খান মৃত্যুবরণ করেন। আইনগত ভাবে তিনি দিল্লির মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বের অধীন হলেও কার্যত তিনি স্বাধীনভাবেই বাংলা ও উড়িষ্যা শাসন করেন।

সুজাউদ্দিন খান

মুর্শিদ কুলি খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর কন্যা জিন্নাত-উন-নিসার স্বামী সুজাউদ্দিন খানকে ১৭২৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ার বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তিনি ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। সুজাউদ্দিন একজন স্বাধীন নবাবের মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-তিন প্রদেশেরই নবাব হয়েছিলেন তিনি। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বাসভাজনদের উচ্চপদ দান করেন। জমিদারদের সাথেও একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিনের শেষ জীবন সুখে কাটেনি। প্রাসাদের অনেক কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কিন্তু দক্ষ হাতে তিনি সংকট মোকাবিলা করেন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। তার অযোগ্যতার কারণে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সুযোগে বিহারের নায়েব-ই-নাজিম আলিবর্দি খান সরফরাজকে আক্রমণ করেন। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। এরপর আলিবর্দি খান মুর্শিদাবাদের সিংহাসন দখল করেন।

আলিবর্দি খান

মুঘল সম্রাটের অনুমোদনে নয়; বরং বাহুবলে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন আলিবর্দি খান। আলিবর্দি খানের শাসনকালে (১৭৪০-১৭৫৬ সাল) বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকদিন ধরেই বর্গি নামে পরিচিত মারাঠি দস্যুরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আলিবর্দি খান ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত ১০ বছর প্রতিরোধ করে বর্গিদের দেশছাড়া করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনকালে আফগান সৈন্যরা বিদ্রোহ করলে তিনি শক্ত হাতে তা দমন করেন। আলিবর্দির সময়ে ইংরেজসহ অনেক ইউরোপীয় বণিকের বাণিজ্যিক তৎপরতা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। একই সাথে তারা সামরিক শক্তিও সঞ্চয় করতে থাকে। আলিবর্দি খান শক্ত হাতে বণিকদের তৎপরতা রোধ করেন। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল আলিবর্দি খান মৃত্যুবরণ করেন। মুর্শিদাবাদের খুশবাগে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

আলিবর্দি খান অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আলিবর্দির প্রথম কন্যা ঘষেটি বেগমের ইচ্ছে ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভগ্নির পুত্র শওকত জঙ্গ নবাব হবেন। ফলে তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কয়েকজন অভিজাতের সমর্থন লাভ করেন ঘষেটি বেগম। তাদের মধ্যে রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রাসাদের ভেতরের এ ষড়যন্ত্রকে কাজে লাগায় বাংলায় বাণিজ্য করতে আসা ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চতুর ইংরেজ বণিকরা। সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তাদের মধ্যে গোপন চুক্তি হয়। উল্লেখ্য, তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ বণিকদের বাংলা থেকে অন্যায় সুবিধা গ্রহণের পথগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় তারা নবাবের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তারা নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দেশীয় চক্রান্তকারীদের সাথে হাত মেলান। অবশেষে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে নবাবের। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। অসহায়ভাবে পরাজয় ঘটে সিরাজউদ্দৌলার। এভাবেই পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নবাবি শাসনের ইতি ঘটে এবং বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

একক কাজ	১. সুবাদার শাহ সুজার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল তা উল্লেখ কর। ২. সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়ের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলো উল্লেখ কর। ৩. স্বাধীন নবাবি প্রতিষ্ঠায় সুবাদার মুর্শিদ কুলি খানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

দলীয় কাজ :

৪. নিম্নের শাসকদের নাম সময়কাল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজাও :

ক্রমিক নং	শাসকের নাম	ধারাবাহিক নাম
১	ইসলাম খান	
২	ইওজ খলজি	
৩	শায়েস্তা খান	
৪	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	
৫	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌড়ের নাম 'জান্নাতাবাদ' কে রাখেন?

ক. শেরশাহ খ. হুমায়ুন

গ. জাহাঙ্গীর ঘ. আকবর

২. বারোভূঁইয়াদের দমনে সুবাদার ইসলাম খানের বিশেষ কৌশলের মধ্যে ছিল—

i. শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলা

ii. রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর

iii. অশ্বারোহী বাহিনী গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাজিরহাট অঞ্চলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান নোমান সাহেব জনপ্রিয়। তার এলাকায় হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় বাস করে। তিনি নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দুদেরকেও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন। তার এ ধর্মীয় উদারতার ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি হয়।

৩. মধ্যযুগের কোন সুলতানের শিক্ষা নোমান সাহেবকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে?

ক. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ খ. সিকান্দার শাহ

গ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ঘ. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

৪. উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডের ফলে—

i. বাংলাসাহিত্য চর্চা নতুন গতি পায়

ii. অদূরদর্শী রাজনীতির পরিচয় মেলে

iii. দক্ষতার সাথে শাসন কার্য পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. টেলিভিশনে প্রাচীন রোমান যোদ্ধাদের যুদ্ধের ছবি দেখছিল সোহেল। সে দেখল যুদ্ধের কৌশল হিসেবে একটি দলের সেনাপতি তার যোদ্ধাকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। সেনাপতি এ সকল যোদ্ধাদের জঙ্গলপথে অতি সঙ্গোপনে নিজেদের আড়াল করে বিপক্ষ দলের প্রাসাদে আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদ দখল করে নেয়।

ক. রাজা গণেশ দিনাজপুরের কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?

খ. ইলিয়াস শাহকে ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বিজয়ী সেনাপতির যুদ্ধকৌশলের প্রতিফলন পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ব্যক্তির ভাগ্য ও কর্মশক্তি সংমিশ্রণ তাকে সফলতা এনে দেয়? যুক্তি দাও।

২. পাহাড়ি অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা হিমছড়ি। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজসাধ্য না হওয়ায় সেখানকার উৎপাদিত পণ্য সময়মতো বাজারজাত করা কষ্টসাধ্য। পাহাড়ের ঢালু জমিতে প্রচুর কলা উৎপন্ন হওয়ায় সেগুলো সময়মতো বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি। একেবারেই স্বল্পমূল্যে কলা বিক্রি হওয়া দেখে স্কুলপড়ুয়া দুর্জয় বড়ুয়া তার মাকে বলল– এ তো দেখি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ক. বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে কে নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন?

খ. বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলা হয়েছিল কেন?

গ. বাংলার কোন শাসকের কথা দুর্জয়ের মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত শাসকের শাসনকালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা যৌক্তিক মনে কর কি?

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

মধ্যযুগ বলতে মূলত মুসলিম শাসন আমলকে বোঝানো হয়। এগারো শতক থেকে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে সুফি সাধকগণ আসতে থাকেন। এতদঞ্চলে ততদিনে বাংলা ভাষার গঠন, প্রকাশ ও বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। বাংলার সাধারণ মানুষের অনেকে এ সময় ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় একটি রূপান্তরিত সমাজকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। এ যুগে বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য লোকধর্ম অনুসারীগণ পাশাপাশি বাস করছিল। ফলে একে অন্যের চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণের মিশ্রণ ঘটতে থাকে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিকাশে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের তথ্যাবলী বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলায় জীবনপ্রণালি ও চিন্তাধারার ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণে সক্ষম হব;
- মধ্যযুগের স্থাপত্য নিদর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিদর্শনে আগ্রহী হব।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

মধ্যযুগে বাংলার সমাজব্যবস্থায় বাংলা ভাষা-ভাষীসহ আরো কিছু ভাষা অনুসারী মানুষের অস্তিত্ব ছিল। একই সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য লোকধর্মানুসারী মানুষেরা বসবাস করতেন। কিন্তু মূলত ইসলাম ও সনাতন ধর্মকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি গড়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমান শাসনকালে সুলতান ছিলেন সমাজজীবনে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। সুলতানকে কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাঁকে সমাজের নেতা হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হতো। সুলতানগণ নিজ নিজ রাজ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি নির্মাণ এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

মুসলমান শাসকরা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জমকালো প্রাসাদে বাস করতেন। তাঁদের রাজধানীও নানারকম মনোমুগ্ধকর অট্টালিকায় সুসজ্জিত থাকত। ঐশ্বর্য ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও রাজদরবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ। শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমান সমাজব্যবস্থায় উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন –এই তিনটি পৃথক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। সৈয়দ, উলামা প্রমুখ শ্রেণি সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল । শিক্ষিত জনগণের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে ভাতা এবং জমি বরাদ্দ করা হতো । মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে বাংলার সমাজে অধিকাংশ মানুষ ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ, ও লোকজ ধর্মাবলম্বী ।

উলামাগণের মধ্য থেকে কাজি, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং ধর্মবিষয়ক অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হতো । শেখগণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জনগনকে শিক্ষা দিতেন।

১৩-১৮ শতকের বাংলার মুসলমান সমাজে একটি অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । যোগ্যতা, প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা তারা নিজেদের সাধারন মানুষের তুলনায় একটি আলাদা শ্রেণি হিসেবে গড়ে তুলেছিল। যেকোনো ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও প্রতিভা দ্বারা রাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ পদে বসতে পারতেন। এক্ষেত্রে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি ও সুবাদার মুর্শিদ কুলি খানের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য । অবশ্য পরবর্তী সময়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে । উত্তরাধিকার সূত্রে মর্যাদাপূর্ণ সরকারি পদ লাভের নীতি প্রচলিত হয় । এ যুগে সামরিক ও বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে সরকারি অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। নিম্ন শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয় । কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণি নিয়ে তৃতীয় শ্রেণি গঠিত ছিল।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বহুমুখী সামাজিক উৎসব পালন করা হতো। 'আকিকা' নামক বিশেষ অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজের একটি অতি পরিচিত সামাজিক প্রথা ছিল । বিয়ে ছিল উৎসবমুখর অনুষ্ঠান । মুসলমানরা মৃতদেহকে কবর দেয় এবং তার আত্মার শান্তির জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচারাদি পালন করে। মুসলমান সমাজে সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত পির বা ফকির সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সেকালে সাধারণ মানুষ তাদের দেওয়া তাবিজ-কবজ ব্যবহার করতো।

বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের অনেকে ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা লোকধর্ম চর্চাকারী অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। ১৩-১৯ শতকের মধ্যে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের সংখ্যা ৩০-৪০ শতাংশ হয়। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের কোনো কোনো বিশ্বাস ও সংস্কার দৈনন্দিন জীবনে পালন করা অব্যাহত রাখেন। এভাবে ইসলামে সংমিশ্রণ ও সমন্বয়বাদী ধারা চালু হয়। পিরের দরগায় সন্ধ্যায় আলো জ্বালানো এবং শিরনি প্রদানসহ অসংখ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মুসলমান সমাজেও অতীতের মতোই বহাল থাকে।

অভিজাত মুসলমানরা ছিল ভোজনবিলাসী। তাদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন মাছ-মাংসের সঙ্গে আচারের নামও পাওয়া যায় । এসব খাবারের পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা আর ঘিয়ে রান্না করা যাবতীয় মুখরোচক খাবার জায়গা করে নেয় । ভাত, মাছ, শাক-সবজি বাঙালি মুসলমানদের প্রতিদিনের খাদ্য ছিল। খাদ্য হিসেবে রুটির ব্যবহারের কথাও জানা যায় । খিচুড়ি তখনকার সমাজে একটি প্রিয় খাদ্য ছিল ।

অভিজাত মুসলমানরা পায়জামা ও গোল গলাবন্ধসহ জামা পরতো। তাদের মাথায় থাকতো পাগড়ি, পায়ে থাকতো রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা চামড়ার জুতা। তারা তাদের আঙুলে অনেক মণি-মুক্তা বসানো আংটি ব্যবহার করতো । মোল্লা ও মৌলবিরাও পায়জামা, জামা এবং টুপি ব্যবহার করতো । গরিব বা নিম্ন শ্রেণির মুসলমানরা লুঙ্গি ও টুপি পরতো। অভিজাত মহিলারা কামিজ ও সালোয়ার ব্যবহার করতো। তারা প্রসাধনী ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। তারা বাহু ও কব্জিতে সোনার অলংকার এবং আঙুলে সোনার আংটি পরতো ।

এ যুগের প্রথম দিকে পারস্য, তুরস্ক থেকে আগত শাসক মুসলমানরা অভিজাত সংস্কৃতি চালু করে। কিন্তু তারা বাংলা অঞ্চলে ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে কঠোর ও নৈতিক মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে মুসলমান সমাজে নতুন নতুন রীতি-নীতির আবির্ভাব ঘটেছিল। সামাজিক জীবনে বিদ্যমান বৈচিত্র্যময় এবং বাস্তববাদী রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি শাসনব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। বাংলার নবাবি শাসনের অবসানের পেছনে শাসকবর্গের অভিজাততন্ত্র ও অন্যান্য দুর্বলতা যথেষ্ট দায়ী ছিল।

হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি

মধ্যযুগে বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ছিল সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ধর্মী। ১৩-১৯ শতকের দিকে হিন্দু-বৌদ্ধ ও লোকজ ধর্মাবলম্বীগণ সংখ্যায় ছিলেন বেশি। এই বৈচিত্র্যময় সমাজের মূল নীতিগুলো এবং সাধারণ সমাজ ব্যবস্থায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। এ যুগেও সমাজে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন পেশাকে ভিত্তি করেই এ প্রথার সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র– সমাজে চারটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ ছিল। এ চার বর্ণের মানুষের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ছিল না বললেই চলে। বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো নগরকেন্দ্রিক জীবনে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষেরা মিলে মিশে থাকতেন। এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিয়ে বা আদান-প্রদান হতো না বললেই চলে। ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে নগরে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব ছিল।

মধ্যযুগের বাংলায় জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যু উপলক্ষে বহু বিচিত্র সামাজিক রীতি-নীতি পালন করা হতো। তখনকার যুগের প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলো বর্তমানকালেও লক্ষ করা যায়। সন্তান জন্মের পর ষষ্ঠ দিনে, এক মাস পর এবং ছয় মাসের সময় নানা প্রকার আয়োজন করা হতো। সমাজে নিয়মিত উপবাস ও একাদশী পালনের রেওয়াজ ছিল।

বিয়ে ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। বাংলায় হিন্দু সমাজে একান্নবর্তী পরিবারই ছিল অধিক। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতো। স্বামীভক্তি হিন্দু সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

এ সময়ে বাংলার সমাজে নারীদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহুসংখ্যক পুরুষ স্ত্রীকে তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতো। কন্যা মাতা-পিতার ওপর, স্ত্রী স্বামীর ওপর, বিধবারা সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। হিন্দু সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির ওপর স্ত্রীদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তথাপি এ যুগে অনেক নারী নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এ যুগের নারীদের কৃতিত্ব কম ছিল না। বিত্তশালী পরিবারে নিয়মিত শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা হতো। বীণা, তানপুরা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে এ যুগের নারীরা পারদর্শী ছিল।

পোশাক ও অলংকার হিসেবে হিন্দু মেয়েরা পাট ও তুলার কাপড়, আংটি, হার, নাকপাশা, দুল, সোনার ব্রেসলেট, সোনার শাঁখা, কানবালা, নথ, অনন্ত, বাজু প্রভৃতি ব্যবহার করতো। বিত্তবান নারীরা অলঙ্কার ব্যবহার করতো। এ সকল অলংকার সোনা, রুপা, হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত হতো এবং মণিমাণিক্য খচিত থাকতো। অনেকে পায়ে নূপুর পরতো। কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানে এ সকল অলংকার ও প্রসাধনী ব্যবহার করা হতো। সাধারণ মেয়েরা নিজেদের গৃহে সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত থাকতো। সালোয়ার কামিজ, শাড়ি তাদের নিত্যদিনের পোশাক ছিল। পুরুষদের সাধারণ পোশাক ছিল পায়জামা, ধুতি। অভিজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাদর ও পাগড়ি ব্যবহার করতো। ধনী ব্যক্তিরা বিশেষত ব্যবসায়ীরা গলায় হার, কানে দুল এবং আঙুলে আংটি পরতো।

মধ্যযুগের খাদ্যের সঙ্গে বর্তমান সমাজের খাদ্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। ভাত ছিল প্রধান খাদ্য। এছাড়া খাদ্য তালিকায় ছিল মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। পোলাও, কোরমাসহ অভিজাত খাবার ধনী মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। চাল থেকে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণরা আমিষ খেত। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, কাঁকরোল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। উল্লেখ্য, তখনকার সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের খাদ্য তালিকার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না।

হিন্দুসমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। ফলে সেখানে নানা বৈষম্য অনুপ্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কৌলীন্য প্রথার ফলে সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজজীবনে কতকগুলো সামাজিক বিশ্বাস জন্মলাভ করেছিল। জ্যোতিষী পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে শুভক্ষণ নির্ধারণ করত। এ সময় জনগণ ইন্দ্রজাল এবং জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করতো।

একক কাজ

১. মধ্যযুগের বাংলায় সামাজিক উৎসব ও সমন্বয়ধর্মী রীতি-নীতি উল্লেখ কর।
২. মধ্যযুগে বাংলার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল?
৩. মধ্যযুগে বাংলার মানুষের বৈচিত্র্যময় খাদ্য সম্পর্কে ধারণা দাও।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই উর্বর। মধ্যযুগে এখানকার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, পাট, আদা, জোয়ার, তিল, শিম, সরিষা ও ডাল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, শশা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আম, কাঁঠাল, কলা, মোসাব্বর, খেজুর ইত্যাদি ফলমূলের ফলনও ছিল প্রচুর। পান, সুপারি, নারকেলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গালা বা দ্রাক্ষাও উৎপন্ন হতো প্রচুর। মুসলমান শাসনের সময় থেকেই বাংলায় পাট ও রেশমের চাষ শুরু হয়।

বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষি ফসলের প্রাচুর্য থাকলেও এ সময়ের চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। আধুনিক সময়ের মতো পানি সেচব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। কৃষককে অধিকাংশ সময়েই সেচের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হতো।

কৃষিপ্রধান দেশ বলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার অধিবাসীর বৃহত্তর অংশ ছিল কৃষক। বাংলার মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে উদ্বৃত্ত বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এ ব্যবসায়িক তৎপরতা কালক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। মুসলমান শাসনকালে বঙ্গে বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, নৌকা নির্মাণ কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল।

বস্ত্র শিল্পে বাংলার অগ্রগতি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নির্মিত বস্ত্রগুলো গুণ ও মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাই বিদেশে এগুলোর প্রচুর চাহিদা ছিল। নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙিন কাপড় এবং বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সাদা কাপড় এখানে তৈরি করা হতো। ঢাকা ছিল মসলিন নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। ইউরোপে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি দিয়াশলাইয়ের বাকসোতে ভরে রাখা যেত। পাট ও রেশমের তৈরি বস্ত্রেও বাংলার কৃতিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলায় চিনি ও গুড় তৈরি এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

বাংলার ক্ষুদ্রশিল্প

মধ্যযুগে বাংলার রকমারি ক্ষুদ্রশিল্পের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ধাতব শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কর্মকারগণ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। এছাড়া দু'ধারী তরবারি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য তৈরি হতো। কলকাতা ও কাশিম বাজারে এদেশের লোকেরা কামান তৈরি করত। কাগজ, গালিচা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের কথাও জানা যায়। বাংলার অন্যতম শিল্প হিসেবে লবণের কথাও জানা যায়। দেশে স্বর্ণকার সম্প্রদায় ছিল। বাঙালি কারিগরেরা স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, কাঠ, পাথর, গজদন্ত ইত্যাদির কাজ বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করত। শঙ্খ শিল্পের জন্য ঢাকার প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। ঢাকার শাঁখারীপট্টি আজও সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রপ্তানিদ্রব্য

বাংলার কৃষি ও শিল্প পণ্যের প্রাচুর্য এবং বিদেশে এগুলোর ব্যাপক চাহিদার ফলে বিদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক তৎপরতা মধ্যযুগে অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করেছিল। বাংলার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুতি কাপড়, মসলিন, রেশমি বস্ত্র, চাল, চিনি, গুড়, আদা, লঙ্কা ইত্যাদি। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে চাল, তামাক, সুপারি, পাট, ফল ইত্যাদি রপ্তানি হতো। বিবিধ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ছাড়াও বাংলা থেকে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ঔষধ ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো।

আমদানিদ্রব্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগই ছিল রপ্তানিনির্ভর। খুব অল্প পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা হতো। বাংলার কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচামাল হিসেবে তুলা আমদানি করা হতো। বাঙালি বণিকেরা গুজরাট থেকে আমদানি করত তুলা, চীন থেকে রেশম, ইরান থেকে শৌখিন দ্রব্য। এছাড়া বাংলায় আমদানি করা হতো স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর।

বন্দর

মধ্যযুগে বাংলার বেশ কিছু সমুদ্রবন্দর ও নদীবন্দর গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রাম ছিল তখনকার বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর। উড়িষ্যা, সোনারগাঁ, গৌড়, বাকলা (বরিশাল), মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, হুগলি, বিহারের পাটনা ও উড়িষ্যার পিপলী উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যবন্দর ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে দ্রব্য ও টাকা-পয়সার লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ বৃদ্ধি পায়। তাই ক্রমে ব্যাংকিং প্রথার বিকাশ ঘটে। এ যুগে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে লেনদেন করা হতো। সমগ্র মধ্যযুগে বাংলায় দ্রব্যসামগ্রী সহজলভ্য ও সস্তা ছিল। চৌদ্দ শতকে বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলাতেই সবচেয়ে সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যেত।

বাংলার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের বৈষম্য ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এদেশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরব ও পারস্য বা ইরানের বণিকেরা। নৌ-বাণিজ্যের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল তাদেরই। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা ব্যবসার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।

একক কাজ : মধ্যযুগে বাংলায় উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

স্থাপত্য ও চিত্রকলা

মধ্যযুগের শাসকগণ স্থাপত্য ও চিত্রকলায় নিজেদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনেক মন্দির, প্যাগোডা, প্রাসাদ, মসজিদ, কবর, দরগাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। সুলতানি আমলের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।

চিত্র-২৯ : আদিনা মসজিদ, গৌড়

মধ্যযুগে বাংলার সুলতানদের রাজধানী প্রথমে ছিল গৌড়, পরে পাণ্ডুয়া এবং এরপর আবার গৌড়। কাজেই এ দুই শহরেই মুসলিম ঐতিহ্যের স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে উঠেছিল। ১৩৬৯ সালে সুলতান সিকান্দার শাহ 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। এ মসজিদের উত্তর পাশে সিকান্দার শাহের কবর নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র-৩০: গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

বর্তমান ঢাকা থেকে ১৫ মাইল পূর্বে সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের একটি কবর আছে। এ কবরের অতি নিকটে পাঁচটি দরগাহ ও পাঁচটি মসজিদ আছে। এগুলো 'পাঁচ পীরের দরগাহ' নামে পরিচিত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি স্থাপত্যকলার একটি সুন্দর নিদর্শন।

সুলতান জালালউদ্দিনের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি পাণ্ডুয়ার 'এক লাখি মসজিদ'। এর নির্মাণকাল ১৪১৮-১৪২৩ সাল। প্রবাদ আছে যে, তখনকার দিনে এক লাখ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই এটি 'এক লাখি মসজিদ' নামে পরিচিত হয়েছে। এ মসজিদ আসলে একটি কবর। এ সমাধিসৌধে সুলতান এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের সমাহিত করা হয়।

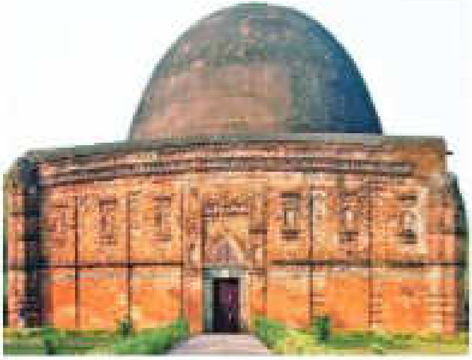

চিত্র-৩১ : এক লাখি মসজিদ, পাণ্ডুয়া

বড় সোনা মসজিদের আর এক নাম 'বারোদুয়ারী মসজিদ'। এতে বৃহৎ বারোটি দরজা ছিল। এ মসজিদে সোনালি রঙের গিলটি করা কারুকার্য ছিল। সম্ভবত এজন্যই এটি সোনা মসজিদ নামে অভিহিত হতো। এ মসজিদটি গৌড়ের বৃহত্তম মসজিদ। আসাম বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হুসেন শাহ এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৫২৭ সালে নসরত শাহ এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন।

চিত্র-৩২ : বড় সোনা মসজিদ (বারদুয়ারি মসজিদ), গৌড়

গৌড় শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান ফিরোজাবাদ গ্রামে 'ছোট সোনামসজিদ' নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদটি ছিল আকারে ছোট। তবে এ মসজিদেও সোনালি রঙের গিলটির কারুকার্য ছিল। সম্ভবত এ কারণেই এটি ছোট সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে জনৈক ওয়ালি মুহাম্মদ এটির নির্মাতা ছিলেন।

চিত্র-৩৩ : ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়

বাগেরহাট জেলায় খান জাহান আলীর মাজার নির্মিত হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে খান জাহান আলী নামক জনৈক পির ঐ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ১৪৫৯ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সুলতান নাসিরউদ্দিন ইলিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন।

চিত্র-৩৪ : খান জাহান আলীর মাজার, বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলার 'ষাটগম্বুজ মসজিদ' বাংলার মুসলমান শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। খান জাহান আলীর মাজার থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাটগম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। অবশ্য এর গম্বুজ ষাটটি নয়, সাতাত্তরটি। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। তুর্কি সেনাপতি ও ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক উলুখ খান জাহান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' সাইট হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

চিত্র-৩৫ : ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

'কদম রসুল' গৌড়ে অবস্থিত। মহানবি (স)-এর পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ ভবনটি নির্মিত হয়। নুসরত শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন (১৫৩১ সাল)। এ ভবনের এক কক্ষে একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মর বেদির উপরে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পদচিহ্ন সংবলিত একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

চিত্র-৩৬ : কদম রসুল, গৌড়

ঢাকা জেলার রামপালে 'বাবা আদমের মসজিদ' অবস্থিত। ১৪৮৩ সালে মালিক কাফুর ফতেহ শাহের রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়। এগুলোর বাইরেও বাংলার নানা স্থানে বহু মসজিদ ও সমাধিসৌধ আছে।

চিত্র-৩৭ : বাবা আদমের মসজিদ, রামপাল, ঢাকা

মসজিদ ও মাজার ছাড়াও এ যুগের নির্মিত বিভিন্ন তোরণ-কক্ষ ও মিনার মুসলমান বাংলার স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এদের মধ্যে রুকনউদ্দিন বরবক শাহ নির্মিত গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' ও আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সমাধি-তোরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌড়ের 'ফিরোজ মিনার' স্থাপত্য শিল্পের আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অনেকে মনে করেন যে, হাবসি সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন।

চিত্র-৩৮ : দাখিল দরওয়াজা, গৌড়

মুঘল আমলে বাংলার শাসকগণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। আজও বাংলার বহু স্থানে মুঘল শাসকগণের শিল্পপ্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মসজিদ, সমাধি ভবন, স্মৃতিসৌধ, মাজার, দুর্গ, স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চিত্র-৩৯ : বড় কাটারা, ঢাকা

মুঘল যুগে 'কাটরা' নামে বেশ ক টি দালান তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো ছিল অতিথিশালা। ঢাকার 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন শাহ সুজা। এটি চকের দক্ষিণ দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হাজিগঞ্জ দুর্গ (বর্তমানে খিজিরপুর দুর্গ নামে পরিচিত)। সম্ভবত সুবাদার মির জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ সাল) এটি নির্মাণ করেন। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল।

সুবাদার শাহজাদা আজম বেশ কিছু ইমারত তৈরি করেছিলেন। বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষে তিনি এক বিশাল কাটরা তৈরি করেছিলেন। তাঁর আমলেই 'লালবাগের শাহি মসজিদ' তৈরি হয়।

চিত্র-৪০ : হাজিগঞ্জ দুর্গ (খিজিরপুর দুর্গ) নারায়ণগঞ্জ

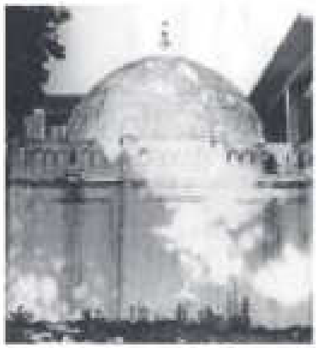
চিত্র-৪১ : লালবাগের শাহি মসজিদ, ঢাকা

চিত্র-৪২ : ছোট কাটারা, ঢাকা

বাংলায় মুঘল শিল্পকলার বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়েস্তা খানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৬৩ সালে শায়েস্তা খান ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। এটি বড় কাটরা থেকে ২০০ গজ দূরে অবস্থিত। লালবাগের কেল্লা আজও শায়েস্তা খানের শাসনকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর শাসনকালের পূর্বেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তিনি এটি শেষ করার পদক্ষেপ নেন। ১৬৯০ সালে ইব্রাহিম খানের শাসনকালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। লালবাগ দুর্গের ভেতর রয়েছে শায়েস্তা খানের কন্যা পরিবিবির মাজার। মার্বেল পাথরে নির্মিত এ সমাধি ভবনটি এখন পর্যন্ত এদেশে সর্বাধিক সুন্দর মুসলিম স্মৃতিসৌধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৬৭৬ সালে শায়েস্তা খান হোসেনী দালান নির্মাণ করেন। চকবাজারের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত শায়েস্তা খানের মসজিদ ও সাতগম্বুজ মসজিদের সাথে শায়েস্তা খানের নাম জড়িয়ে আছে।

চিত্র-৪৩ : লালবাগের কেল্লা, ঢাকা

চিত্র-৪৪ : বিবি পরির সমাধিসৌধ, ঢাকা

বাংলার নবাবদের সময়েও বহু ইমারত নির্মিত হয় পুরান ঢাকায়। জিনজিরা প্রাসাদ তাঁদেরই কীর্তি। মুর্শিদ কুলি খানের আমলে বেগম বাজার মসজিদ নির্মিত হয়। মুর্শিদাবাদে তিনি একটি কাটরা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। চেহেল 'সেতুন' নামে একটি প্রাসাদও তাঁর সময়ে তৈরি। এটি ছিল একটি প্রকাণ্ড দরবার ভবন। এ সমস্ত স্থাপনা ছাড়াও মুঘল আমলে অনেক দুর্গ, ঈদগাহ, হাম্মামখানা, চিল্লাখানা ও সেতু নির্মাণ করা হয়। মুঘল যুগের এ সকল শিল্পকীর্তি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

চিত্র-৪৫ : হোসেনী দালান, ঢাকা

দলীয় কাজ

ছকে এলোমেলোভাবে প্রদত্ত স্থাপত্য কীর্তিগুলো কোথায় অবস্থিত তা সঠিকভাবে পাশে উল্লেখ করে তালিকা প্রস্তুত কর।

ক্রমিক নং	স্থাপত্য কীর্তির নাম	অবস্থান
১	আদিনা মসজিদ	ঢাকা
২	বড় সোনামসজিদ	বাগেরহাট
৩	পরিবিবির মাজার	গৌড়
৪	ষাটগম্বুজ মসজিদ	সোনারগাঁও
৫	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি	পাণ্ডুয়া
৬	কান্তজীর মন্দির	দিনাজপুর

ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমান কালের মতো সে যুগেও মানুষেরা বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতো। এর মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, শিব, শিবলিঙ্গ, চণ্ডী, মনসা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, মদন, নারায়ণ, ব্রহ্ম, অগ্নি, শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাঙালি হিন্দুরা সামাজিক জীবনে দুর্গাপূজা, দশহরা, গঙ্গা স্নান, অষ্টমী স্নান এবং মাঘী সপ্তমী স্নানকে পবিত্র বলে মনে করত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নিকট গঙ্গাজল অত্যন্ত পবিত্র। তারা দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করত। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রাচীন বাংলার সময়ের ন্যায় এ যুগেও অপরিসীম কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ধর্ম কর্ম পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন। শ্রেণিভেদ ছাড়াও হিন্দু সমাজে কতকগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। যেমন– শৈব, শাক্ত ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে এ সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সময়ে হিন্দু সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা।

মুসলমানরা বর্তমান সময়ের মতোই মধ্যযুগেও বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা মুসলমান সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হতো। মুসলমানরা রমজান মাসে রোজা রাখতো। এছাড়াও শব-ই-বরাত ও শব-ই-কদর পালন করতো।

উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাদের সাধ্যমতো নতুন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে একে অন্যের গৃহে গিয়ে কুশল ও দাওয়াত বিনিময়ের মাধ্যমে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বভাবকে সুদৃঢ় করত। সুলতান, সুবাদার ও নবাবগণ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে জনগণের সান্নিধ্যে আসতেন। মুসলমানরা মহানবির (সা.) জন্মদিন পালন করত। বর্তমান সময়ের মতো মধ্যযুগেও মহরম উৎসব পালিত হতো। এটি শিয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে পরিচিত। এ উদ্দেশ্যে শিয়ারা 'তাজিয়া' তৈরি করত।

মধ্যযুগে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ধীরে ধীরে সমাজে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৩-১৯ শতকের মধ্যে ৪০% এর মতো মুসলমান জনগোষ্ঠী তৈরি হয়। ১৯-২০ শতকে এসে এই সংখ্যা ৫০% হয়। মুসলমানরা ইসলামি রীতি-নীতি মেনে চলতে থাকে। ধর্মের মধ্যে সংস্কৃতির অনেকগুলি উপাদান প্রাচীনকাল থেকে এসে যুক্ত হয়। এভাবে সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারা চালু হয়। অভিজাত ও দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাকের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল।

মুসলমান সমাজে সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত পির বা ফকির সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ধর্ম সাধনার জন্য 'দরগা' প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসকবর্গ ও জনগণ সকলের কাছেই তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বাংলায় ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলমান সমাজও বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলায় মুসলমান সমাজে দুইটি পৃথক শ্রেণি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি বাংলার সীমানার বাইরে থেকে আগত অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান, অন্যটি স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত বিপুল সংখ্যক মুসলমান। এই বিদেশি ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্টি ও রীতি-নীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। প্রাচীন কালের বৌদ্ধদের মতো মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের উদারতা এবং স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা পরিলক্ষিত হয়।

একক কাজ : মধ্যযুগে মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানগুলো কীরূপ ছিল?

ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির জন্য সুলতানি ও মুঘল শাসনকালের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হলেন ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর শাসনকালেই প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর প্রণয়মূলক কাব্য 'ইউসুফ-জুলেখা' ফার্সি রচনা থেকে অনুবাদ করেন। সুলতানি যুগে আরও কয়েকজন কবি ফার্সি কাব্যের অনুবাদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দৌলত উজির বাহরাম খান ও দোনা গাজীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনার পথপ্রদর্শক হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অবদান উল্লেখযোগ্য। বিজয়কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন 'রসুল বিজয়' কাব্য রচয়িতা জয়নুদ্দীন। বাংলার মুসলমান কবিরা পদাবলি রচনা করেন। চাঁদ কাজী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম পদাবলি কাব্যের স্রষ্টা। পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এ যুগে মুসলমান কবিরা অনেক কাব্য বাংলায় রচনা করেন। বাংলা ভাষায় মুসলমানরা সঙ্গীতবিদ্যার চর্চাও করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীতবিদ্যার ওপর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'রাগমালা' রচনা করেছিলেন কবি ফয়জুল্লাহ্। কবি মোজাম্মেল 'নীতিশাস্ত্র বার্তা' ও 'সাতনামা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও মুসলমান কবিদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বহু আরবি ও ফার্সি শব্দ তাঁরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ, খোদা, নবি, পয়গম্বর, কিতাব ইত্যাদি বহু শব্দ সে সময়ের মুসলমান কবি-লেখকদের ব্যবহারের ফলে বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। একইভাবে ভগবান, স্রষ্টা, ঈশ্বর, দেব-দেবী ইত্যাদি বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত ও আদি বাংলার কবিগণ।

সুলতানি যুগে হিন্দু কবিরাও সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। এক্ষেত্রে শাসকবর্গের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা কবি-সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এ যুগের বিখ্যাত কবি ও লেখকগণের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভগবত' ও 'পুরাণ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহ ও নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন।

বৈষ্ণব কবি হিসেবে বৃন্দাবন দাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত গ্রন্থ 'চৈতন্য-ভগবত' রচনা করেন। চন্দ্রাবতী 'মনসা মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যেও মধ্যযুগের শাসকদের যথেষ্ট অবদান ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এজন্য অনেক শাসক এর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃত ভাষার চর্চাও করতেন। মুসলমান শাসনকালে বাংলা সংস্কৃত ও ফার্সি সাহিত্যের এক বিরাট কেন্দ্র ছিল। শুধু বাংলা ও সংস্কৃতই নয়, আরবি ও ফার্সি কাব্যের চর্চাও সুলতানি যুগে ছিল।

মুঘল যুগে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যায়। তবে মুঘল শাসকগণ সুলতানি যুগের শাসকদের মতো ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোনো সহযোগিতা করেননি। বাংলার জমিদারগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

মধ্যযুগে প্রতিবেশী আরাকানের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ফলে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দৌলত কাজী। আলাওল ছিলেন রাজসভার আর একজন কবি। তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মাবতী' ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েকটি ফার্সি কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া 'রাগনামা' নামে একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন।

বাহরাম খান রচনা করেন 'লাইলী-মজনু' কাব্যগ্রন্থ। 'জঙ্গনামা' ও 'হিতজ্ঞান বাণী' গ্রন্থগুলো কবি কাজী হায়াৎ মাহমুদ রচিত। কবি শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পুঁথি সাহিত্যিক।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

মধ্যযুগে বাংলার শাসকগণ কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এ সময় শিক্ষার দ্বার হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শেখদের খানকাহ্ ও উলেমাদের গৃহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মুসলমান শাসনের সময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদের সঙ্গেই মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। বালক-বালিকারা একত্রে মক্তব ও

পাঠশালায় লেখাপড়া করতো। স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। ফলে সাধারণ মুসলমান মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিল। শাসকবর্গের ভাষা ছিল ফার্সি। তাই এ ভাষা প্রায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। সরকারি চাকরি লাভের আশায় অনেকে ফার্সি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এ যুগে বাংলা ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আরবি ও ফার্সি ভাষায় অজ্ঞ সাধারণ মুসলমান যেন ইসলামের ধ্যান-ধারণা বুঝতে পারে, সেজন্য অনেকেই বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন। তাঁদের রচনাবলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

মধ্যযুগের পূর্বে বাংলার সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। মধ্যযুগে সমাজের সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতো। গুরুর আবাসস্থল কিংবা বিত্তবানদের গৃহে পাঠশালা বসতো। কখনও কখনও একই ঘরের চালার নিচে মক্তব ও পাঠশালা বসত। সকালে মুনশি মক্তবের শিক্ষার্থীদের এবং বিকালে গুরু তার ছাত্রদের পাঠশালায় শিক্ষা দান করতেন। বিত্তবান লোকেরা পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন। বালক-বালিকারা একত্রে পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতো।

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য 'টোল' ছিল। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার জন্য নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। অনেক নারী এ যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণি সর্বদা নিজেদের জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকতো। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ যুগে সমাজে জনগণের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য কতকগুলো সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; যেমন– ধর্মীয় সংগীত, জনপ্রিয় লোক-কাহিনি ও নাটক-গাথা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন কাব্য ফার্সি রচনার অনুবাদ?

ক. রসুল বিজয়   খ. রাগমালা

গ. ইউসুফ-জোলেখা   ঘ. সাতনামা

২. কেন মধ্য যুগে হিন্দু সম্প্রদায় ফার্সি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতো?

ক. সাহিত্য রচনা করতে   খ. চাকরি পেতে

গ. প্রশাসনিক কাজ করতে   ঘ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিমনের চাচা অনেক বছর ধরে আমেরিকাসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ব্যবসায় করে আসছিলেন। তিনি তার ব্যবসায় প্রসারের লক্ষ্যে নিজ দেশে ফিরে নারায়ণগঞ্জে একটি শাখা অফিস খোলেন। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করেন। ব্যবসার সুবিধার জন্য তিনি ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহার করেন।

৩. লিমনের চাচার বাণিজ্যিক প্রসার বাংলার কোন আমলের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়?

ক. পাল খ. সেন

গ. সুলতানি ঘ. মুঘল

৪. বাণিজ্যিক প্রসারের ফলেই উক্ত আমলে গড়ে উঠেছিল—

i. সমুদ্রবন্দর

ii. নদীবন্দর

iii. স্থলবন্দর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রেজা সাহেব চট্টগ্রামের একজন বড় ব্যবসায়ী। তার আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় তিনি জাহাজের মাধ্যমেই বিদেশ থেকে সোনা, রুপা, দামি পাথরের গয়না, রেশমি সুতা, বিভিন্ন দামি মসলা আমদানি করেন। পাশাপাশি তিনি চা ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করেন। গত সপ্তাহে তিনি তার মেয়ের জন্মদিনে পোলাও, কাবাব, রেজালা ও মিষ্টির আয়োজন করেন। সবাই খাবার খেয়ে খুবই খুশি।

ক. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে?

খ. কৃষিকে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মুল উৎস বলা হয় কেন?

গ. রেজা সাহেবের বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে কোন আমলের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রেজা সাহেবের অর্থনৈতিক অবস্থা উক্ত আমলের চেয়ে কি সমৃদ্ধ ছিল বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও।

২. গ্রামের স্কুলশিক্ষক কামাল হোসেনের মেয়ে অনন্যা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার বান্ধবী রাবেয়া সুলতানাকে তার বাবা আর স্কুলে পাঠাবেন না। তিনি বলেন যে, মেয়েদের এর থেকে বেশি পড়ালেখার দরকার নেই। শিক্ষক কামাল হোসেন মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে রাবেয়ার বাবার এই মানসিকতা জেনে বললেন, বর্তমান সময়ে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম এবং শিক্ষা ছাড়া নারী-পুরুষ সবাই অসম্পূর্ণ। সব যুগেই শিক্ষার গুরুত্ব ছিল এবং আছে।

ক. হোসেনী দালান কে নির্মাণ করেন?

খ. কেন মধ্যযুগকে মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়? বর্ণনা দাও।

গ. রাবেয়ার বাবার শিক্ষাবিষয়ক এই মানসিকতার সঙ্গে মধ্যযুগের শিক্ষার কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাবেয়ার বাবার মতো মানসিকতার কারণেই কি মধ্যযুগের মানুষেরা শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব

প্রাচীনকাল থেকে ভারত উপমহাদেশ–বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধনসম্পদে পূর্ণ একটি দেশ। এ অঞ্চলের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তখন পাওয়া যেত। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কৃষকের ক্ষেতভরা ফসল, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ থাকত। কুটির শিল্পেও গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নতমানের ছিল। এর মধ্যে জগৎ বিখ্যাত ছিল মসলিন কাপড়। তাছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য ও মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকেই এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। পরবর্তী সময়ে তারা এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। এদেশে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র করে কীভাবে ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানি এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূচনা করে, বর্তমান অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারব;
- ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় দিওয়ানি লাভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইংরেজ শাসনের ফলে রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

ইউরোপীয়দের আগমন

সপ্তম শতক থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করত মূলত সমুদ্রপথে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্রপথে উপমহাদেশে আসার অভিযান শুরু করে।

পর্তুগিজ

পর্তুগিজদের মধ্যে যে দুঃসাহসী নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে এদেশে আসেন, তাঁর নাম ভাস্কো-ডা-গামা। তিনি ১৪৯৮ সালের ২৭শে মে ভারতের পশ্চিম-উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। উপমহাদেশে তাঁর এ আগমন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

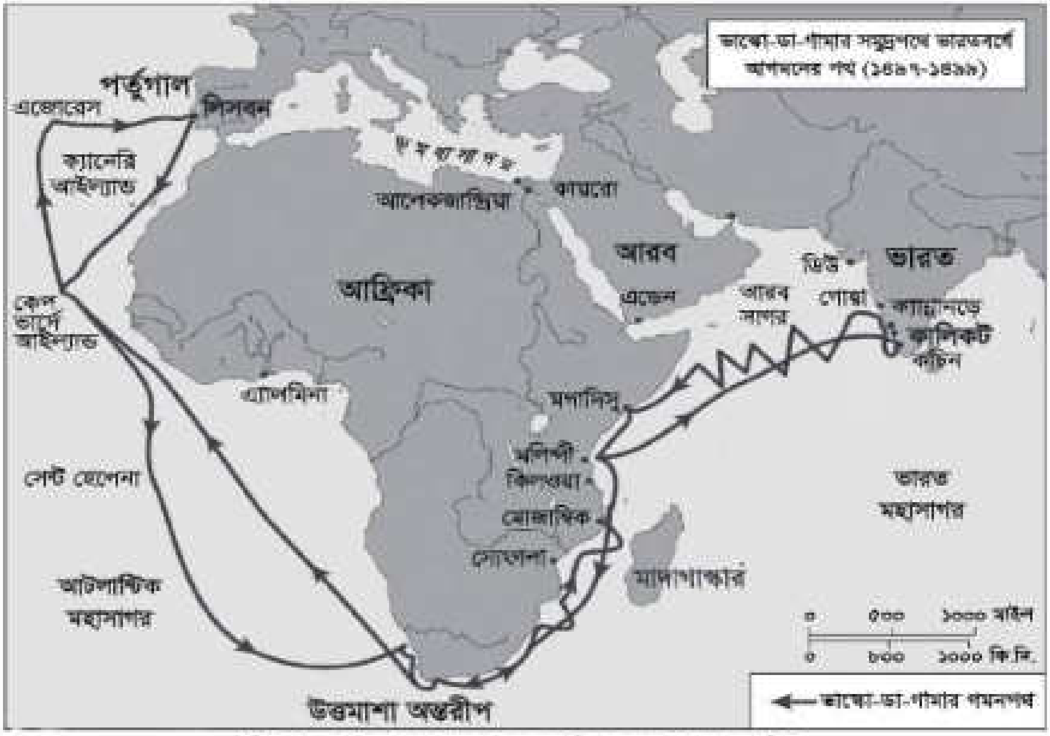

চিত্র-৪৬ : ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষে আগমনের পথের মানচিত্র

পর্তুগিজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসে কিন্তু ক্রমে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

১৫৩৮ সালে তারা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে বাণিজ্যঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। ১৫৭৯ সালে হুগলী নামক স্থানে তারা উপনিবেশ গড়ে তোলে। এরপর তারা উড়িষ্যা এবং বাংলার কিছু অঞ্চলে বসতি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়। বাংলাসহ ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন অংশে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও পর্তুগিজদের বিভিন্ন অপকর্ম ও দস্যুতার কারণে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দীপের ঘাঁটি দখল করে বাংলা থেকে বিতাড়ন করেন। তাছাড়া পর্তুগিজরা বাংলায় আগত অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গেও পরাজিত হয়। এরপর তারা দেশ ত্যাগ করে।

ওলন্দাজ বা ডাচ

হল্যান্ডের অধিবাসী ওলন্দাজ বা ডাচরা 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ১৬০২ সালে এই উপমহাদেশে আসে। ভারতবর্ষে তারা কোম্পানির সনদ অনুযায়ী কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া ও বাঁকুড়ায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তাছাড়া বালাসোর, কাশিমবাজার এবং বরানগরেও তারা কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজ ও অপর ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ শুরু হয় এবং একই সঙ্গে শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৯ সালে সংঘটিত বিদারার যুদ্ধে তারা ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৮০৫ সালে তারা সকল বাণিজ্য কেন্দ্র গুটিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে পর্তুগিজ পরে ওলন্দাজ শক্তির পতন, ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম করে।

দিনেমার

দিনেমার বা ডেনমার্কের অধিবাসী একদল বণিক বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করেন। ১৬২০ সালে তারা দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলায় ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৬৭৬ সালে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু বাংলায় তারা লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। ১৮৪৫ সালে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে কোনো রকম বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমাররা এদেশ ত্যাগ করে।

দলীয় কাজ : পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের উপমহাদেশে স্থাপিত বাণিজ্য কুঠিগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

ইংরেজ

সমুদ্রপথে ইউরোপীয় বণিকদের সাফল্য প্রাচ্যের ধনসম্পদের প্রাচুর্য, ইংরেজ বণিকদেরকেও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করে। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বণিক সংঘ গড়ে তোলে। বণিক সংঘটি ১৬০০ সালে রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। এই সনদপত্র নিয়ে কোম্পানির প্রতিনিধি বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আশায় আকবরের দরবারে হাজির হন। এরপর ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ সালে রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে ১৬১২ সালে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৬১৫ সালে প্রথম জেমসের দূত হয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন স্যার টমাস রো। সম্রাটের কাছ থেকে তিনি ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেন। কোম্পানি সুরাট, আগ্রা, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে তাদের ভিত্তি মজবুত করে।

কোম্পানি দ্বিতীয় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে মসলিপট্টমে। এরপর বাংলার বালাসোরে আরেকটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তাদের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা করমণ্ডল (মাদ্রাজ শহর) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। বাংলার সুবাদার শাহ সুজার অনুমোদন লাভ করে তারা ১৬৫৮ সালে হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এভাবে কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহেও বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।

১৬৬৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিনের সঙ্গে বিয়ের যৌতুক হিসেবে লাভ করেন বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) শহর। অর্থাভাবে চার্লস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে শহরটি বিক্রি করে দেন। পরবর্তীকালে এই বোম্বাই শহরই কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জব চার্নক নামে আরেকজন ইংরেজ ১৬৯০ সালে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। ভাগীরথী নদীর তীরের এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়। এখানেই কোম্পানি ১৭০০ সালে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। ধীরে ধীরে এটি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দিল্লির সম্রাট ফাররুখ শিয়ার তাদের বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। এর উপর ভিত্তি করে কোম্পানি তাদের প্রতিনিধিদের দস্তক প্রদান করত। এই দস্তক দেখিয়ে তারা বিনা শুল্কে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত। একই সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও কোম্পানি লাভ করে। সম্রাটের এই ফরমানকে কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা বলে উল্লেখ করা হয়। **এই অধিকার লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।**

একক কাজ

১. যে তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয় তার নাম লেখ।

২. সম্রাট ফাররুখ শিয়ার কর্তৃক ইংরেজদের দেয়া সনদপত্র প্রদানের ফলে প্রাপ্ত অধিকারগুলোকে মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা বলে কেন? কারণ লিপিবদ্ধ কর।

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বশেষে আগত ইউরোপীয় বণিকদের কোম্পানি হচ্ছে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৬৪ সালে এই বাণিজ্যিক কোম্পানি গঠিত হয়। ১৬৬৮ সালে কোম্পানি সর্বপ্রথম সুরাট এবং পরের বছর মসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৭৩ সালে পন্ডিচেরিতে ফরাসি উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

১৬৭৪ সালের পর থেকে তারা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। কোম্পানি বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দননগর নামক স্থানটি কিনে নেয়। ১৬৯০ থেকে ১৬৯২ সালের মধ্যে চন্দননগর একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত ফরাসি বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ সালে কোম্পানি এখানে একটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে ১৬৯৩ সালে ফরাসিরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। পরবর্তীকালে তারা কাশিমবাজার বালাসোরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজ বণিকরা যখন ব্যবসায়-বাণিজ্যে দৃঢ় অবস্থানে, তখন ফরাসিরা এদেশে আসে। এ অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির মতো ফরাসিরাও এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে দুই ইউরোপীয় শক্তি— ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, উন্নত রণকৌশলের কাছে ফরাসিরা পরাজিত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিরা বাংলার নবাবকে সমর্থন দেয়। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য ফরাসিদের আরও বিপর্যস্ত করে ফেলে। ফলে বাংলার ফরাসি বাণিজ্য কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানি পরাজিত হলে তারা এদেশ ত্যাগ করে। ফলে ইংরেজরা ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়।

একক কাজ : ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ কর।

পলাশির যুদ্ধ

১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত আলীবর্দি খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি সফলভাবে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি তাঁর সময়ে মারাঠা ও বর্গিদের দমন করে রাখতে সক্ষম হন। সুকৌশলে ইংরেজ বণিক কোম্পানিকেও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

নবাব মৃত্যুর আগে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দি খানের মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে নবাবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সিংহাসনে বসার পর থেকে তাঁকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। তাঁর প্রথম সমস্যা ছিল পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে আলিবর্দি খানের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজ নবাব হওয়ায় আশাহত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এদের সঙ্গে যোগ দেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ এবং অন্যরা। কৌশলে নবাব ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দি করেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে সিরাজউদ্দৌলা এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করে নেন।

নবাব পারিবারিক ষড়যন্ত্র কৌশলে দমন করলেও তাঁর বিরুদ্ধে বাইরে ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরো অনেকে। প্রত্যেকে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে।

পলাশি যুদ্ধের কারণ

ইতিহাসের যেসব ঘটনা একটি দেশের জনগণের ভাগ্যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে, পলাশির যুদ্ধ এ অঞ্চলের জনগণের জন্য তেমনি এক ঘটনা ছিল। এই ঘটনার পেছনের কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসার পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজরা নতুন নবাবকে কোনো উপঢৌকন পাঠায়নি এবং তাঁর সঙ্গে কোনো সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎও করেনি। ইংরেজদের এই অসৌজন্যমূলক আচরণে নবাব ক্ষুব্ধ হন।
- নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে।
- ইংরেজ কোম্পানি দস্তকের অপব্যবহার করলে দেশীয় বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। নবাব দস্তকের অপব্যবহার করতে নিষেধ করেন এবং বাণিজ্যিক শর্ত মেনে চলার আদেশ দেন। কোম্পানি নবাবের সে আদেশও অগ্রাহ্য করে।
- আলিবর্দি খানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া জনগণকে নির্যাতন করার মতো ধৃষ্টতাও তারা দেখাতে থাকে।

চিত্র-৪৭ : নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস তার পরিবারের সদস্যদেরসহ প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নেন। তাকে ফেরত দেয়ার জন্য নবাব ইংরেজদের নিকট দূত পাঠান। ইংরেজ গভর্নর নবাবের দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। এর আগে শওকত জঙ্গের বিদ্রোহের সময়ও ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়।

ইংরেজদের একের পর এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অবাধ্যতা নবাবকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৭৫৭ সালের জুন মাসের শুরুতে নবাব কোলকাতা অধিকার করে নেন। যাত্রাপথে তিনি কাশিম বাজার কুঠিও দখল করেন। নবাবের অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। হলওয়েলসহ বেশ কিছু ইংরেজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নবাবকে হেয় করার জন্য হলওয়েল এক মিথ্যা প্রচারণা চালায়, যা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে, ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ১৪.১০ ফুট প্রস্থ ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয়। এতে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। এই মিথ্যা প্রচার মাদ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে উত্তেজিত হয়ে কোলকাতা দখল করার জন্য ওয়াটসন ও ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় চলে আসে। তারা নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদকে পরাজিত করে কোলকাতা দখল করে নেয়। নবাব তাঁর চারদিকে ষড়যন্ত্র ও শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নতজানু ও অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। এটি ইতিহাসে 'আলীনগর সন্ধি' নামে খ্যাত।

আলীনগর সন্ধিতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পর ক্লাইভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি পায়। নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপে সংঘটিত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দননগর কুঠি দখল করে নেয়। নবাব এ অবস্থায় ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ইংরেজদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন। এতে ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হয়ে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এই ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হয় জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ রাজা, রায়বল্লভ প্রধান সেনাপতি প্রমুখ।

পলাশির যুদ্ধের ঘটনা

পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা এ উপমহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির আমবাগানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতোমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ তার অবস্থান সুদৃঢ় করে সন্ধি ভঙ্গের অজুহাতে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নবাবের পক্ষে দেশপ্রেমিক মীর মদন, মোহন লাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মীর মদন নিহত হন। নবাবের বিজয় আসন্ন জেনে মীর জাফর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। মীর মদনের মৃত্যু ও মীর জাফরের অসহযোগিতা নবাবকে বিচলিত করে। নবাবের সেনাপতি মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। নবাব কোরআন স্পর্শ করিয়ে শপথ নেয়ালেও মীর জাফরের ষড়যন্ত্র থামেনি। নবাবের সৈন্যরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, সেই সময় মীর জাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার অনিবার্য পরিণতি নবাবের পরাজয়।

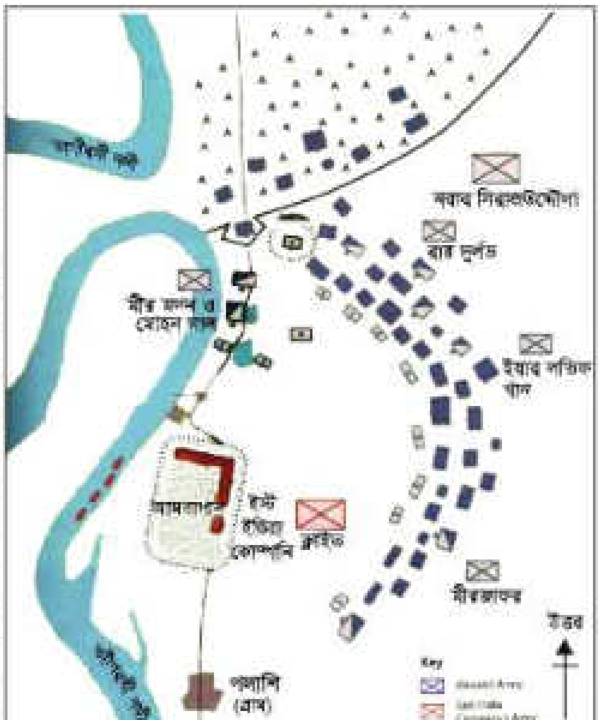

চিত্র-৪৮ : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র

নবাবের পতনের কারণ

- নবাবের সেনাপতি মীর জাফর ও তার সহযোগীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অসহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।
- নবাবের সেনাপতি থেকে সভাসদ অধিকাংশই দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখেছে।
- তরুণ নবাবের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দেন।
- সেনাপতি মীর জাফরের ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও তিনি বার বার তার ওপরই নির্ভর করেছেন।
- ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্কতা, ফরাসি এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্র-এসব বিষয়ে আলিবর্দি খানের উপদেশ সিরাজউদ্দৌলার কাছে গুরুত্ব পায়নি।
- জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ অন্যান্য অভিজাত চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা।
- রবার্ট ক্লাইভ ছিল দূরদর্শী, সূক্ষ্ম ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন।

পলাশি যুদ্ধের ফলাফল

- সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু বাংলায় মুঘল শাসনের অবসান ঘটায় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করে।
- যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও তিনি ছিলেন নামেমাত্র নবাব, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- পলাশি যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ফরাসিরা এদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।
- এ যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির স্বার্থে এদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন হতে থাকে।
- পলাশির যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণতি ছিল উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা এবং এভাবেই এযুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা অস্তমিত হয়।

সুতরাং পলাশির যুদ্ধ একটি খণ্ডযুদ্ধ হলেও বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দলীয় কাজ : পলাশি প্রান্তরে নবাব ও ইংরেজ সেনাবাহিনীর অবস্থান দেখিয়ে একটি চিত্র অঙ্কন কর।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ সাল)

পলাশি যুদ্ধের পর মীর জাফরকে নামেমাত্র নবাব করা হয়। কিন্তু ইংরেজরা যে উদ্দেশ্যে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসিয়েছিল, তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নতুন নবাব কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। নিজের ক্ষমতা রক্ষা করতেও তাকে বারবার ক্লাইভের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার ক্লাইভের রাজকার্যে ঘনঘন হস্তক্ষেপ নবাবের পছন্দ ছিল না। ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য মীর জাফর আরেক বিদেশি কোম্পানি ওলন্দাজদের সাথে আঁতাত করে। বিষয়টি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মীর জাফরের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে অক্ষমতা এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ১৭৬০ সালে ইংরেজ গভর্নর ভান্সিটার্ট মীর জাফরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মীর কাশিমকে শর্তসাপেক্ষে সিংহাসনে বসান। ক্ষমতারোহণের পর মীর কাশিম স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

বক্সারের যুদ্ধের কারণ

মীর কাশিম একজন সুদক্ষ শাসক, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের কল্যাণের প্রতি সচেতন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। এ উদ্দেশে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোই শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন :

- মীর কাশিম প্রথমে ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং প্রশাসনকে প্রভাবমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন। নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ ও রাজধানীর চারদিকে পরিখা খনন করেন।
- ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সৈনিকদের ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য দুইজন ইউরোপীয় সৈনিককে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।
- অস্ত্র-গোলাবারুদের জন্য যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয় সেজন্য রাজধানীতে কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ ইংরেজদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখালে তাকে পদচ্যুত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করেন।
- ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইংরেজদের ব্যবসা করার যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তারা তার অপব্যবহার করে। 'দস্তক' নামের ছাড়পত্রের অপব্যবহারের ফলে দেশি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। ফলে, নবাব সবার জন্য আন্তঃবাণিজ্যে শুল্ক উঠিয়ে দেন। এজন্য ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া লাভজনক ব্যবসায় অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে নবাব কোনো রকম আপোস করতে না চাইলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।
- নবাবের গৃহীত পদক্ষেপ ছিল দেশ ও জনগণের স্বার্থে, যা ইংরেজদের স্বার্থপরিপন্থি। ফলে ক্ষুব্ধ ইংরেজরা এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।
- ১৭৬৩ সালে ক্ষুব্ধ হয়ে পাটনা কুঠি অধ্যক্ষ এলিস দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া নবাবের আর কোনো উপায় থাকে না। মীর কাশিম সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে এলিসকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। ১৭৬৩ সালে কোলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

ইতোমধ্যে ইংরেজরা মীর জাফরকে পুনরায় বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। নবাব ইংরেজদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৭৬৪ সালে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলিত বাহিনী মেজর মনরোর কাছে পরাজিত হয়।

মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরেজ শক্তি অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে থাকে। এ কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধের পাশাপাশি বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্বও অনেক বেশি।

একক কাজ : ছকটি সঠিক করে সাজাও

বক্সারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও দেশের নাম

নাম	দেশ
মীর কাশিম	ইংল্যান্ড
সম্রাট শাহ আলম	বাংলা
মেজর মনরো	অযোধ্যা
সুজাউদ্দৌলা	দিল্লি

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

১. এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে ইংরেজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

২. এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে যান। দিল্লির সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। মীর কাশিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩. ইংরেজরা অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে কারা ও এলাহাবাদ হস্তগত করতে সক্ষম হয়।

৪. এ যুদ্ধের ফলে শুধু বাংলার নবাবই পরাজিত হননি, তাঁর মিত্র ভারত সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হন। এই তিন শক্তির একসঙ্গে পরাজয়ে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫. এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে থাকে। শুরু হয় প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ সালে মীর জাফরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাজিম-উদ-দৌলাকে শর্তসাপেক্ষে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয়। শর্ত থাকে যে, তিনি তার পিতার মতো ইংরেজদের নিজস্ব পুরাতন দস্তক অনুযায়ী বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করতে দেবেন এবং দেশীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা বাতিল করবেন। এ সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব বা খাজনা ও কর আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্থাৎ দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসে প্রথমেই পরাজিত অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লির সম্রাটের দিকে নজর দেন। তিনি অযোধ্যার পরাজিত নবাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। বিনিময়ে আদায় করে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অপরদিকে তিনি দেওয়ানি শর্তসংবলিত দুইটি চুক্তি করেন। একটি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে। এতে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি দান করা হয়। এর বিনিময়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নবাব প্রতিবছর সম্রাটকে পাঠাবেন। এই টাকা নিয়মিত পাঠানোর জামিনদার হবে কোম্পানি।

অপর চুক্তিটি হয় মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সঙ্গে। বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সকল শর্ত মেনে নেন। এই চুক্তিদ্বয়ের ফলে কোম্পানির ক্ষমতা একচেটিয়া বৃদ্ধি পায়। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে। দেওয়ানির গুরুত্ব হলো-

১. দেওয়ানি লাভ কোম্পানির শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়।

২. সম্রাট ও নবাব উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।

৩. দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থলোভ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে দেশীয় বণিকশ্রেণি, সাধারণ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে।

৪. দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। এর পরিমাণ এতটাই ছিল যে, এই অর্থের বলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

দলীয় কাজ : 'ইংরেজ শাসনের সূচনায় দেওয়ানি লাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা'– (দলীয় বিতর্ক)

দ্বৈত শাসন

দিল্লি কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি বা খাজনা ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় ষোলোআনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে।

১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় 'দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য।' এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিত্র-৪৯ : রবার্ট ক্লাইভ

১৭৬৫-৭০ সালে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও আদায় প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ-নির্যাতনে বাংলার মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায়

নবাবের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারা দেশে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। তিনি হন প্রথম গভর্নর জেনারেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২শে মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের নিজ নিজ জমির ওপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে বন্দোবস্ত চালু করা হয়, তাকেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং জমিদাররা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।
- রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমিদার জমিদারি ভোগের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করে।
- এ প্রথা চালু হওয়ার ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সরকার স্বয়ং শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের ভূমির কিছু অংশ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল।
- নতুন এক জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে। যাদের সাথে প্রজাদের প্রায় সম্পর্ক ছিল না।
- এই জমিদার শ্রেণির অধিকাংশই ছিল উঠতি পুঁজিপতি। তারাই বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান সমর্থক শ্রেণি ও ভিত্তি ছিলো।

ফলাফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। কর্নওয়ালিস জমিদার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরন এক ছিল না। ফলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ ব্যবস্থায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

সুবিধা

- এ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে সরকার তার আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। যে কারণে বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কোম্পানির একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে ওঠে। ফলে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়করণ এবং দীর্ঘায়িতকরণে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
- জমির ওপর জমিদারের স্থায়ী মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার কারণে অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় নানা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হয়। জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের ব্যবস্থা করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

ত্রুটি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। তারা ধীরে ধীরে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। অপর দিকে জমিতে প্রজাদের পুরোনো স্বত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদার ইচ্ছে করলেই যেকোনো সময় তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। প্রথম দিকে প্রজাস্বত্ব আইন না থাকায় তাদের ভাগ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে জমিদারের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হতো। ১০৬

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির সঠিক জরিপের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নিষ্কর জমির ওপর বেশি রাজস্ব ধার্য করা হতো। জমির সীমা নির্ধারিত না থাকায় পরবর্তীকালে মামলা বিবাদও দেখা দিত।
- সূর্যাস্ত আইনে নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা পরিশোধ বিধানের কঠোরতার কারণে অনেক বড় বড় জমিদারি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
- জমিদারি আয় ও স্বত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জমিদাররা নায়েব-গোমস্তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে শহরে বসবাস শুরু করে। এসব অনুপস্থিত জমিদারদের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে জমির উৎপাদন কমে যেতে থাকে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে জমি ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ফলে ব্রিটিশ শাসনের সুবিধাভোগী অনেক ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ যারা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হন, তারা জমিদারি কিনে আভিজাত্যের মর্যাদা লাভে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে দেশীয় পুঁজি, দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যায়। অপর দিকে কোম্পানিও সম্ভাব্য এদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে বেঁচে যায়।
- পূর্ববাংলা যা আজ আমাদের বাংলাদেশ এর রায়ত বা প্রজারা ছিলেন প্রধানত মুসলমান এবং অধিকাংশ জমিদার ছিলেন নতুন বিত্তশালী হিন্দু জমিদার। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সাম্প্রদায়িক রূপও গ্রহণ করতে থাকে শুরু থেকেই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। আবার এই জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সমাজে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠছিল, বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে, যারা পরবর্তী সময়ে দেশ-জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

একক কাজ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার অর্থনীতি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পর্তুগিজ নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারত উপমহাদেশে আসেন?

ক. ভাস্কো-ডা-গামা   খ. ক্যাপ্টেন হকিন্স

গ. স্যার টমাস রো   ঘ. জব চার্নক

২. নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; কারণ–

i. নবাবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইংরেজরা কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে।

ii. চুক্তি ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

iii. নবাব ইংরেজদের সম্পদ দখল করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনেক বছর আগের কথা। সিলেটের রহমান সাহেব ও তাঁর তিন বন্ধু স্থানীয় জমিদারের নিকট থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আশায় সেখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে

সাক্ষাৎ করেন। তারা একটি নদীর তীরে অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি গ্রাম ইজারা নিয়ে কুঠি স্থাপন করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রহমান সাহেব ও তার গোষ্ঠীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করারও অধিকার প্রদান করে।

৩. তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোন ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য কার্যক্রমের সাথে রহমান সাহেব ও তাঁর বন্ধুদের গৃহীত ব্যবস্থার মিল রয়েছে?

ক. পর্তুগিজ খ. ওলন্দাজ

গ. দিনেমার ঘ. ইংরেজ

৪. উক্ত জাতির কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল—

i. সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির হওয়া

ii. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করা

iii. বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মামুন ও কামাল দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর পর তাদের স্টার গার্মেন্টসের মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধলে বড় ভাই মামুন গার্মেন্টস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছোট ভাই কামাল সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। গার্মেন্টসের আয় থেকে কামালকে সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

ক. ভাস্কো-ডা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন?

খ. প্রাচীনকালে অনেকেই বাংলা অঞ্চলে বাণিজ্য করতে এসেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের ক্ষমতা ভাগাভাগির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. বেশ কিছুদিন ধরে পলাশপুর চা বাগানের বার্ষিক আয় ওঠানামা করছিল। এ জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের আয় নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা কয়েক বছরের জন্য কতিপয় ব্যক্তির নিকট বরাদ্দ দেয়। এ ব্যবস্থায় নতুন ইজারাদাররা বেশি মুনাফা লাভের আশায় চা শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময়ে কাজ করাতে বাধ্য করে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই। এ ব্যবস্থার ফলে চা-বাগান ও চা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি কোনো দৃষ্টি ছিল না ইজারাদারদের। বাগান কর্তৃপক্ষ এ দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এবং বাগানের আয় সুনির্দিষ্ট করতে ইজারাদারদের সাথে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ সম্পাদন করে।

ক. কোন নদীর তীরে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?

খ. 'অন্ধকূপ হত্যা' বলে আদৌ কি কিছু ছিল?

গ. উদ্দীপকের নতুন ব্যবস্থার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল? যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে এক নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা করে বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- 'নবজাগরণ' ও সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব;
- ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইংরেজ শাসনামলে উল্লেখযোগ্য সংস্কারকদের অবদান বর্ণনা করতে পারব।

প্রতিরোধ আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। পলাশি যুদ্ধের ১৫/২০ বছর পর থেকে এই আন্দোলনের শুরু। নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী, ফকির-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র থাকত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু, ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। তীর্থস্থান দর্শনের ওপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদের ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি। ১৭৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে।

১৭৭১ সালে মজনু শাহ উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭-১৭৮৬ সাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সঙ্গে মজনু শাহ বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর যুদ্ধকৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনোই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। ১৮০০ সালে তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

একক কাজ : মীর কাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসীদের প্রতি ইংরেজদের কড়া নজরের সম্পর্ক কী? এর পরিণতি কী হলো?

তিতুমিরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমির চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তার দুইটি ধারা প্রবহমান ছিল। যার একটি ওয়াহাবি বা মুহম্মদিয়া আন্দোলন, অপরটি ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সমাজ সংস্কার করা। বাংলার ওয়াহাবিরা তিতুমিরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমিরের নেতৃত্বে পরিচালিত তারিখ-ই-মুহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

চিত্র-৫০ : তিতুমির

১৮২৭ সালে তিতুমীর হজ শেষে ধর্ম সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতি সাড়া দেয়। ফলে, জমিদাররা প্রজাদের ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমির এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী।

ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস জুগিয়েছে। উদ্বুদ্ধ করেছে দেশপ্রেমিক হতে, প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিতে।

একক কাজ : ১। তিতুমিরের কোন কোন কর্মকাণ্ড দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক তার তালিকা কর।
২। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে পরিণত হলো–এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান কর।

নীল বিদ্রোহ

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। তবে ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে সবসময় তারা সজাগ ছিল। ব্যবসায়িক ঝুঁকির কারণেই তাদের বাংলার উর্বর ফসলের ক্ষেতে দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর ক্ষেতগুলোতে খাদ্য-ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য-ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্যিক ফসল।

ঐ সময়ে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্তুত বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে নীল চাষ শুরু হয়।

নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীল চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশপরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো।

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায়। নীলকররা বিষয়টি বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া, প্রথম দিকে তারা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নীল চাষ অব্যাহত রাখা চাষিদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উপর্যুক্ত বঞ্চনার হাত থেকে চাষিদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আইন ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আইন যারা প্রয়োগ করবেন, সেসব বিচারকের বেশির ভাগ ছিলেন নীলকরদের স্বদেশি বা বন্ধু। আবার নীলকররাও অনেক সময় নিজেরাই অবৈতনিক (অনারারি) ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পেতেন। ফলে আইনের আশ্রয় বা সুবিচার পাওয়া চাষির জন্য ছিল অসম্ভব। এমতাবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার রূপেও আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, অবাধ্য নীলচাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

শেষ পর্যন্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীলচাষিরা ১৮৫৯ সালে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেণী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কৃষকরা নীলচাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশও অগ্রাহ্য করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার 'ইন্ডিগো কমিশন' বা 'নীল কমিশন' গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ সালে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

একক কাজ : ১. কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহ ঘটে–তার ওপর কেস স্টাডি প্রস্তুত কর।

২. বাংলায় চিরতরে নীল চাষ বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরো।

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ্ বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার শামাইল গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের ওপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর অনাচারমুক্ত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের নামই 'ফরায়েজি আন্দোলন'।

'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যারা ফরজ পালন করেন তাঁরাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরীয়তউল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্যকরণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে সমালোচনার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ 'বিধর্মীর দেশ' বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী-বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য তাঁর অনুসারী মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। শরীয়তউল্লাহর ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস, তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশজুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন।

জমিদারশ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে প্রজাদের রক্ষার জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ সালে তাঁর ওপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর যোগ্য পুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মতো পণ্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

একক কাজ : হাজী শরিয়তউল্লাহ্ কীভাবে নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একাধারে ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকশ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এই আন্দোলনের চরিত্র শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হাজার হাজার কৃষক ও শত শত তাঁতি ফরায়েজি আন্দোলনে যোগদান করেন।

দুদু মিয়া ছিলেন ফরায়েজিদের গুরু বা ওস্তাদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি পরিহার করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে তিনি এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চল নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এ অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ। তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটা সেনাবাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) গঠন করা হয়েছিল।

ফরায়েজিদের সরকারব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতকগুলো হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। দুদু মিয়া তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী জমিদার, নীলকর সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশীয় জমিদাররা বিদেশি ইংরেজ সরকার ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থাকে। কিন্তু দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী না পেয়ে বারবার তাঁকে মুক্তি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে ইংরেজ সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভীত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কোলকাতার কারাগারে আটকে রাখে। ১৮৬০ সালে তিনি মুক্তি পান এবং ১৮৬২ সালে এই দেশপ্রেমী বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

একক কাজ : ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে দুদু মিয়াকে কারারুদ্ধ করে। এর পেছনের কারণগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাও।

নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

নবজাগরণ

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। আবার অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ সালে) প্রভাবও এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে এই শিক্ষিত বাঙালিদের মনে নবজাগরণের সূচনা হয়।

ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে ওঠে আধুনিক চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। এই নব ভাবধারা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছুসংখ্যক উদারচেতা প্রশাসকেরও অবদান রয়েছে। তাঁরা দেশি ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য ব্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছেন। তাছাড়া খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

রাজা রামমোহন রায়

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ সালে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিশেষ করে ইংরেজি, বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে তুহফাতুল মুআহহিদদীন (একেশ্বরবাদ সৌরভ), মনজারাতুল আদিয়ান (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি সম্বাদ কৌমুদী, মিরাতুল আখবার ও ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন।

চিত্র-৫১ : রাজা রামমোহন রায়

তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ সালে ২০শে আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৮২৩ সালে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ সালে কোলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এ দেশের মানুষকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্যও আবেদন করেন।

১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ সালে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ভাষা ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কাজ : রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গ্রন্থ এবং প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর তালিকা তৈরি কর।

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

হেনরি লুই ডিরোজিও ১৮০৯ সালের ১৮ই এপ্রিল কোলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পর্তুগিজ এবং মা ছিলেন বাঙালি। ডিরোজিও ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমিতে পড়ালেখা শুরু করেন। এই শিক্ষকের আদর্শ ডিরোজিওকে তাঁর শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রভাবিত করে রেখেছিল। বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি, বাগ্মিতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা তৎকালীন তরুণ সমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

চিত্র-৫২ : হেনরি লুই ডিরোজিও

ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা এ দেশবাসীকে বারবার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। এ কারণে এই তরুণরা ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী সব কাজের ঘোর বিরোধিতা করেছে। যেমন– প্রেস আইন, মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানি, ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি উদাসীন ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন এদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে।

তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমিতে তরুণদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থি হিন্দু এবং গোঁড়াপন্থী খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসেও আঘাত হানে। ফলে এরা ডিরোজিও এবং তার একাডেমির সদস্যদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। ১৮৩০ সালে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এতে সমাজ, ধর্ম, বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এটি বন্ধ করে দেয়। তিনি ১৮৩১ সালে 'হিসপাবাস' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা এবং 'ইস্ট ইন্ডিয়া' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পরও তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলতে থাকে তাঁর অনুসারীরা। ডিরোজিওর অনুসারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

একক কাজ : 'যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান'-এর আলোকে ডিরোজিওর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন কর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তিনি তাঁর তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে; আর হৃদয়ের মমত্ববোধ তাঁর মা ভাগবতী দেবীর কাছ থেকে। দারিদ্র্যের কারণে রাতে বাতি জ্বালিয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না। ফলে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কোলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকের সংখ্যার হিসাব গুনতে গুনতে।

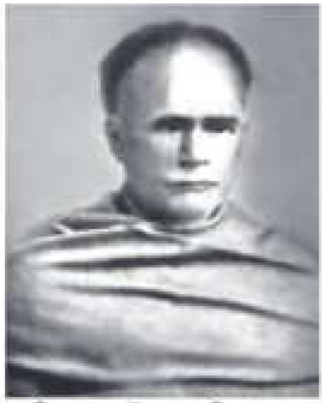
চিত্র-৫৩ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অসাধারণ মেধা আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ঐ বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করেন।

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামে-গঞ্জে ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন। এখন এটি বিদ্যাসাগর কলেজ নামে খ্যাত।

তিনি একজন সফল সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। তিনি কন্যাশিশু হত্যা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের পক্ষে কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ সালে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়।

বিদ্যাসাগর দান-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হতো। যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে লেখাপড়া করতো। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের ইচ্ছায় তিনি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি একবার ভরা বর্ষায় গভীর রাতে দামোদর নদ পার হয়ে বাড়ি যান।

১৮৯১ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

একক কাজ : বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলার কারণ অনুসন্ধান কর।

হাজী মুহম্মদ মহসীন

হাজী মুহম্মদ মহসীন ১৭৩২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ। মায়ের নাম ছিল জয়নাব খানম। তাদের আদি নিবাস ছিল পারস্যে। হাজী মুহম্মদ মহসীনের পূর্বপুরুষ ভাগ্য অন্বেষণে হুগলী শহরে এসে বসবাস শুরু করেন।

মহসীনের শিক্ষাজীবন শুরু হুগলীতে। তাঁর গৃহশিক্ষক আগা সিরাজি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাঁর কাছে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ভোলানাথ ওস্তাদ নামে একজন সঙ্গীতবিদের কাছে সংগীত ও সেতার বাজানো শেখেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি হুগলী ফিরে আসেন এবং ১৭৬২ সালে দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি মক্কা, মদিনা গমন করেন এবং পবিত্র হজ পালন করেন। আরব, মিশর, পারস্য ভ্রমণ করে তিনি সাতাশ বছর পর দেশে ফিরে আসেন। আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি এবং ইতিহাস ও বীজগণিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

চিত্র-৫৪ : হাজী মুহম্মদ মহসীন

১৮০৩ সালে তাঁর একমাত্র বোনের মৃত্যু হলে নিঃসন্তান বোনের বিশাল সম্পত্তির মালিক হন তিনি। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তখন বাংলার মুসলমানদের ছিল চরম দুর্দিন। অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থ শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করেন।

তিনি হুগলীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ সালে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কার্যে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। মহসীন ফান্ডের অর্থে তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে হুগলী মহসীন ফান্ড, হুগলী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৮৪৮ সালে হুগলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহসীন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এর মধ্যে সৈয়দ আমির আলীও ছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর মৃত্যুর পরও বাঙালি মুসলমানদের জন্য শিক্ষার পথ সুগম করে যান। এই দানশীল বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষ ১৮১২ সালে ২৯শে নভেম্বর হুগলীতে পরলোকগমন করেন।

কাজ : জনহিতকর কাজে হাজী মুহম্মদ মহসীনের অর্থ কোথায় কোথায় ব্যয় হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নওয়াব আবদুল লতিফ

আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কোলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ সালে তাকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে কৃতিত্বের জন্য সরকার তাঁকে প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করে।

চিত্র-৫৫ : নওয়াব আবদুল লতিফ

তিনি বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ সালে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক এক রচনা

প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু, বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ সালে মহসীন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ।

নওয়াব আবদুল লতিফের সারা জীবনের কর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি :

১. মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষ ভাব দূর করা;

২. মুসলমান সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৩. হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা।

একক কাজ : নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মের উদ্দেশ্য তিনটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

সৈয়দ আমির আলি

চিত্র-৫৬ : সৈয়দ আমির আলি

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমির আলি। তিনি ১৮৪৯ সালে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ সালে লন্ডনের লিংকস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ সালে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন।

বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ সালে কোলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

তিনি পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ সালে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি ১৮৮৪ সালে কোলকাতায় মাদ্রাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।

তাঁর বিখ্যাত দুইটি গ্রন্থ ***'The Spirit of Islam'*** এবং ***'A Short History of the Saracens'***-এ ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯১২ সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সৈয়দ আমির আলি নারী অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন।

একক কাজ : সৈয়দ আমির আলি মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য কী কাজ করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ছিলেন নারীশিক্ষার একজন প্রবর্তক, সমাজসেবক ও লেখক। তিনি কুমিল্লার হোমনাবাদ পরগনার (বর্তমান লাকসাম) পশ্চিমগাঁও-এ ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী চৌধুরী ছিলেন হোমনাবাদ-পশ্চিমগাঁও-এর জমিদার। পারিবারিক পরিবেশে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ফয়জুন্নেছা বাংলা ভাষা ছাড়াও আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন।

ফয়জুন্নেছা একজন বিচক্ষণ, কর্মদক্ষ ও বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমগাঁও-এর জমিদারি লাভ করেন। মা আরাফান্নেছার মৃত্যুর পর মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি বিশাল জমিদারির অধিকারী হন। তিনি সফলভাবে এই জমিদারি পরিচালনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ফয়জুন্নেছা একজন প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটি ভারত উপমহাদেশে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। কালক্রমে এটি একটি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় নবাব 'ফয়জুন্নেছা কলেজ'। দরিদ্র নারীদের চিকিৎসার জন্য তিনি নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি 'ফয়জুন্নেছা জেনানা হাসপাতাল' নামে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি নিজ জমিদারি এলাকার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, মসজিদ ও মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, দিঘি-পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ফয়জুন্নেছার সৃজনশীল প্রতিভার দিকটি নিহিত আছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। তিনি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রূপজালাল ছাড়াও তত্ত্ব ও জাতীয় সংগীত, সংগীত সার ও সংগীত লহরী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ফয়জুন্নেছা সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বান্ধব, ঢাকা প্রকাশ, মুসলমান বন্ধু, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা তাঁর আর্থিক সহায়তা লাভ করে।

নারীশিক্ষার প্রসার ও জনহিতৈষী কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে মহারানী ভিক্টোরিয়া ১৮৮৯ সালে ফয়জুন্নেছাকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম নারী যিনি এই সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন। ১৯০৩ সালে নিজ গ্রামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীকে 'একুশে পদক' (মরণোত্তর) প্রদান করে সম্মান জানায়।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। মুসলমান সমাজের মেয়েরা সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। মুসলমান মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে যিনি মুক্তির ডাক দিলেন, তাঁর নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যাকে সবাই বেগম রোকেয়া নামে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলি সাবের।

চিত্র-৫৭ : বেগম রোকেয়া

২০২৪

মায়ের নাম মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানি। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো গভীর রাতে, যাতে বাড়ির লোক টের না পায়। বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা-বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। তাঁর 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচুর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞানচর্চার উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি জীবনের বাকি সময়টা নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ সালে কোলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৩২ সালে এই মহীয়সী নারী কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

একক কাজ : সমাজে নারীদের করুণদশা উল্লেখ করে রোকেয়া যে বইগুলো লিখেছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলীয় কাজ

উপস্থিত বক্তৃতা : নবজাগরণ আন্দোলনের সংস্কারকদের সম্পর্কে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন কর (লটারির মাধ্যমে নির্বাচন)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার প্রকাশক কে ছিলেন?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গ. রাজা রামমোহন রায় ঘ. হাজী শরীয়তউল্লাহ

২. ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়, কারণ ইংরেজরা–

i. তাদের ডাকাত-দস্যু মনে করত

ii. তীর্থস্থান দর্শনের ওপর করারোপ করত

iii. তাদের চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সচেতন ও ধর্মীয় সুশিক্ষিত লোকের অভাবে রসুলপুর গ্রামের লোকজন নানারকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ অঞ্চলের মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসেন আব্দুল্লাহ নামক একজন সচেতন ব্যক্তি।

৩. কোন ব্যক্তির জীবনের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আব্দুল্লাহ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন?

ক. হাজী শরীয়তউল্লাহ খ. দুদু মিয়া
গ. তিতুমীর ঘ. গোলাম মাসুম

৪. উক্ত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরন ছিল—

i. সামাজিক
ii. ধর্মীয়
iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রূপপুর অঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের জীবনধারা সচ্ছল ছিল না। বিভিন্ন সিগারেট কোম্পানির লোকজন তাদের এই অসচ্ছল জীবনধারার সুযোগ নিয়ে তাদের চড়া সুদে অর্থ প্রদান করে অসম চুক্তির মাধ্যমে তামাক চাষে আগ্রহী করে তোলে। কৃষকদের প্রাপ্ত মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় কম হওয়ায় তামাক চাষিরা কোম্পানির রাহুগ্রাস থেকে বের হতে না পেরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। উপরন্তু টেলিভিশনে তামাকের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা জেনে ঐ অঞ্চলের তামাক চাষিরা করিম ও জলিলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং কোম্পানির এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়।

ক. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ বলা হয় কাকে?
খ. ফরায়েজি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
গ. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো তোমার পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত ঘটনাটি কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় কতটুকু যুক্তিযুক্ত ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

২. সুলতানপুর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। সেখানে এখনো নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার বিরাজমান। এ গ্রামের মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ জামিলা বেগম মেয়েদের পড়ালেখা করতে বাধা দেন। মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়াকে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থি এবং গর্হিত কাজ মনে করতেন।

ক. 'The Spirit of Islam' বইটির লেখক কে?
খ. 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
গ. উদ্দীপকে জামিলা বেগমের চরিত্রের বিপরীত চিত্র পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন মহীয়সীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর বর্তমান নারী-শিক্ষার অগ্রগতিতে উক্ত মহীয়সীর অবদান অনস্বীকার্য? যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়
ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

বাংলার অধিবাসীরা কখনোই ইংরেজ শাসকদের মেনে নিতে পারেনি। ফলে পলাশি যুদ্ধের পরপরই এ অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী নানা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। এই অধ্যায়ে ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বাঙালি তথা তৎকালীন ভারতবাসীর গৌরব ও আত্মত্যাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ইংরেজ শাসনকালে বাংলার স্বাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এর ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা পাব।
- সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবে।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

পলাশি যুদ্ধের এক'শ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এসবই এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো–

রাজনৈতিক : পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার, একের পর এক ভারতের রাজ্যগুলো দখল, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তাছাড়া অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় ভারতের তৎকালীন দেশীয় রাজন্যবর্গ ক্ষুব্ধ হয়।

অর্থনৈতিক : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের আগেই এতদঞ্চলের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক জমিদারও সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দরিদ্র কৃষকের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়। জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের তীব্র শোষণের শিকার এসব কৃষক মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

সামাজিক ও ধর্মীয় : ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের ক্ষোভের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সামাজিক ও ধর্মীয়। ইংরেজরা তাদের জমিদারি প্রথায় আগের মতই সিংহভাগ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদেরই সম্পৃক্ত করে। মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা অমানবিক বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে হিন্দু জমিদারদের প্রতি যেমন, তেমনি ইংরেজদের সম্বন্ধেও বৈরিতা অনুভব করে।

সামরিক : সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি এবং বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার ওপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয়েই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়।

কাজ : বাংলাদেশের কোথায় কোথায় এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল—বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে সে এলাকাগুলো দেখাও।

বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সিপাহি ও যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করেও পরাজিত হন। এই সংগ্রামে জড়িত অধিকাংশই যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

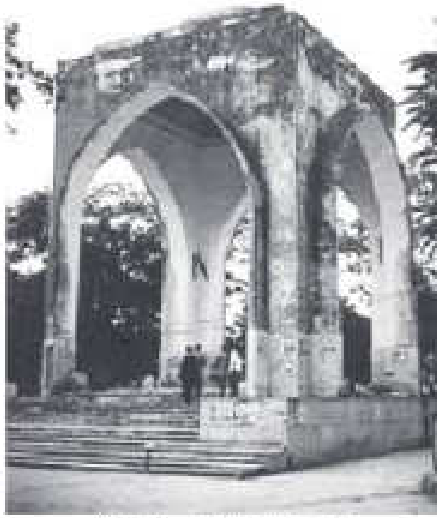

চিত্র-৫৮ : বাহাদুর শাহ পার্ক

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (মিয়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। রানি লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে নিহত হন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান করেন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এ ধরনের নির্মম ঘটনা ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর মাধ্যমেই শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৮৫৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে সব আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। তবে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব : এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। এই নীতি ছিলো মূলত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় রাজ্য আত্মসাৎ করার নীতি যাতে অপুত্রক/উত্তরাধিকার বিহীন রাজাদের রাজ্য গ্রাস করার জন্য দত্তক নেয়ার সুযোগ বন্ধ করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণাপত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের স্রোত থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

> **একক কাজ :** কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সিপাহিরা বিদ্রোহ করে, সে কারণগুলো চিহ্নিত কর।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১ সালে)

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজদের ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and Rule)-এর আকাঙ্ক্ষা বরাবরই ছিল। এখানে অভিজাত হিন্দুদের প্রতি বঞ্চিত মুসলমানদের মধ্যে যে অবিশ্বাস ছিল সেটাকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গভঙ্গ উদ্যোগ নেয় ইংরেজ শাসকেরা। হিন্দুদের বড়ো অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের বড়ো অংশ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে। এই প্রচেষ্টা বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক অস্বস্তি ও অবিশ্বাসকে রাজনৈতিকভাবে সামনে নিয়ে আসে।

পটভূমি : ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ভাগ হবার পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। সে বছর অক্টোবরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এবং ভারতের আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কোলকাতা।

বঙ্গভঙ্গের কারণ : বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল, যা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

প্রশাসনিক কারণ : লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কোলকাতা থেকে বাংলার পূর্বাংশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন গোটা বাংলা অঞ্চলকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেননি। তাই ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণ : বাংলা ভাগের পেছনে আরো কারণ ছিল যার একটি অর্থনৈতিক, অপরটি সামাজিক। তখন কোলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতি, অগ্রগতি সবই ছিল কোলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। অথচ এখান থেকে যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো তার জন্যও সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় এলাকার লোকজন অশিক্ষিত থেকে যায়। কর্মহীনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল বলে অনেকেই মনে করেন।

রাজনৈতিক কারণ : লর্ড কার্জন শুধু শাসন-সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেননি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা

২০২৫

থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তির ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এভাবে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হলো।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া : বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলোও বঙ্গ বিভাগে সন্তোষ প্রকাশ করে। সুতরাং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মানুষেরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে।

অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন উঁচুতলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে এরা বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলকসহ গোখলের মতো উদারপন্থী নেতাও অংশ নেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে অভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ও নবাব সলিমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ, আব্দুর রসুল, খান বাহাদুর মো: ইউসুফ, আব্দুল হালিম গজনবী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুহাম্মদ গোলাম হোসেন, মৌলবী লিয়াকত হোসেন, সৈয়দ হাফিজুর রহমান চৌধুরী, আবুল কাশেমসহ অনেকেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। চরমপন্থী নেতাদের কারণে এই আন্দোলনের সঙ্গে সশস্ত্র কার্যকলাপও যুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে উভয় ধর্মের অভিজাত শ্রেণির একাংশ মনে করে এটি তাদের জয়। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ বঙ্গভঙ্গ রদে মর্মাহত হয়। ব্রিটিশ সরকার ও অভিজাত নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের কেউই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে না। একদল উদারবাদী নেতৃবৃন্দ একে ব্রিটিশ সরকারের কূট রাজনীতির উদাহরণ বলে মনে করেন। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে হাজার বছরের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে।

একক কাজ : বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চিহ্নিত কর।

স্বদেশি আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর বিপ্লবী তৎপরতার মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাকেই স্বদেশি আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুইটি– বয়কট ও স্বদেশি।

'বয়কট' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। ক্রমে ক্রমে 'বয়কট' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। বয়কট শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ফলে স্বদেশি আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন করার অপরাধে সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বহু শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়া হয়। যে কারণে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে ওঠে।

স্বদেশি আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মতো পণ্য বর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এ সময় দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যুক্ত হতে থাকে। আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন বাড়ানোর জন্য বাংলার জেলায় জেলায় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমন– ঢাকায় অনুশীলন, কোলকাতায় যুগান্তর সমিতি, বরিশালে স্বদেশবান্ধব, ফরিদপুরে ব্রতী, ময়মনসিংহে সাধনা ইত্যাদি সংগঠনের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো। জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা দেশাত্মবোধক বিভিন্ন রচনা পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেন প্রমুখ। বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে আন্দোলনের পক্ষে মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগাতেও সক্ষম হন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বেঙ্গলি, সঞ্জীবনী, যুগান্তর, অমৃতবাজার, সন্ধ্যা হিতবাদীসহ বিভিন্ন বাংলা-ইংরেজি পত্রিকা স্বদেশপ্রেম ও বাঙালি জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ লেখা ছাপতে থাকে। বাংলার নারীসমাজ স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে শুরু করে।

> **দলীয় কাজ :** যেসব পত্র-পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিল, সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর। স্বদেশি আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠা বিপ্লবী সমিতিগুলোর নামের পাশে স্থানের নাম সাজাও।

স্বদেশি আন্দোলনে তাৎক্ষণিক সফলতা না এলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণসচেতনতার জন্ম হয়। এ আন্দোলন উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রসমাজ যুক্ত হওয়ার কারণে গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই জনগণ রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে।

ভারতের পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে তাদের উপস্থিতির শুরু এখান থেকেই। এই আন্দোলনের আরেকটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এর ফলে দেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা স্থাপনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বাংলার ধনী ব্যক্তিরা কলকারখানা স্থাপন করতে থাকেন। যেমন : স্বদেশি তাঁত বস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি, কাগজ, চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হয়। ঐ সময় আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে কুষ্টিয়াতে বিখ্যাত মোহিনী মিল স্থাপিত হয়। তাছাড়া আরো ছোটখাটো দেশি শিল্পকারখানা এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞান, শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আগ্রহ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, মুকুন্দ দাসের বাংলা ভূ-খণ্ড এবং এ ভূ-খণ্ডের সকল মানুষের উদ্দেশে দেশাত্মবোধক গানগুলো ঐ সময় রচিত। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সময়ে রচনা করেন, যা আমাদের জাতীয় সংগীত।

স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম দিক হচ্ছে, এই আন্দোলনের কারণে হিন্দু-মুসলমানের হাজার বছরের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নানা ঘটনার মাধ্যমে এই তিক্ততা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভাঙন শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে তা আরো তিক্ত হয়। ফলে সম্পর্কের এই ভাঙন এতদঞ্চলের রাজনীতি, সমাজ ও জাতীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে, যা শেষ হয় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে।

একক কাজ : স্বদেশি আন্দোলনের ফলে যেসব দেশীয় শিল্প স্থাপিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণআন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ : ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে মান্য করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হয়। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পক্ষে যোগদানের জন্য ১৯২০ সালে সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা হতাশ হয় এবং খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দুই ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

বাংলায় খিলাফত আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় আসেন। ঢাকার জনগণ তাদের 'আল্লাহু আকবর' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। তাছাড়া ১৯শে মার্চ হরতালের দিন মুসলমান সম্প্রদায় রোজা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উপোস থাকে। এদিন ঢাকায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, খিলাফত অক্ষুণ্ন না থাকলে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা অসম্ভব। এ বছর ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে এক সভা হয়। পাশাপাশি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচিও পালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। সরকারের দমননীতির পাশাপাশি চলে সংবাদপত্রে হস্তক্ষেপ। তাছাড়া মহাযুদ্ধের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয়

জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ সালে এই আন্দোলন সর্ব ভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আন্দোলন সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দুই-ই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত অভিজাতদের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন (১৯১১-১৯৩০ সাল)

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলা স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকায় অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য তরুণ বাঙালি যুবক ক্ষুদিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ব্রিটিশবিরোধী এই আন্দোলন মূলত শেষ হয় ১৯৩০ সালে। তবে এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ। পুলিন বিহারী দাস ছিলেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক। এরা বোমা তৈরি থেকে শুরু করে সব ধরনের অস্ত্র সংগ্রহসহ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণ, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। অপরদিকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এছাড়া মানিকতলা বোমা হামলাসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ সময় ফাঁসি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে কারাবন্দি ও দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এই সমস্ত চরম দমননীতির কারণে প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। এই আন্দোলন কোলকাতাকেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে বাংলার পূর্বাংশে। এই সময় বিপ্লবীরা আবার হত্যা, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে কোলকাতায় গোপনে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কোলকাতা, যশোর, খুলনায় অনেক সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড চার্লস হার্ডিঞ্জকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়। হার্ডিঞ্জ বেঁচে যান। কিন্তু বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বাংলার অনেক বিপ্লবী বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের মতো দুঃসাহসী চেষ্টাও করেছেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বাংলা স্বাধীন করা। এঁদের মধ্যে ছিলেন

বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ শক্তির প্রতিপক্ষ জার্মানি থেকে অস্ত্র সাহায্যের আশ্বাস পান। তবে সরকার গোপনে এ খবর জানতে পেরে কৌশলে বাঘা যতীনসহ তার সঙ্গীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করে। গ্রেফতারের সময় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে চিত্তপ্রিয় নামের এক বিপ্লবী শহিদ হন। বাঘা যতীন তিন বিপ্লবীসহ আহত অবস্থায় বন্দি হন। বন্দি থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বন্দি অপর দুই বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্মম অত্যাচারও বিপ্লবীদের পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাদের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, চোরাগোপ্তা হামলা, বোমাবাজি ক্রমাগত চলতে থাকে। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের বলে অনেক বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলে বিপ্লবী কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে শুরু করেন আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, সে সময় বিপ্লবী আন্দোলন বাংলায় বেশি শক্তিশালী ছিল এবং বাঙালিরা ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। বাঙালি তরুণরা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে বারবার সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চিত্র-৫৯ : মাস্টারদা সূর্য সেন

এমন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, যাঁর আসল নাম সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪)। কলেজজীবনে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এর মধ্যেই তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং এ সময় তিনি অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক বিপ্লবী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাং সরকার'-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। সূর্য সেনের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার বিশাল বাহিনী নিয়োগ করে। চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটতে বাধ্য হন। অনেক তরুণ বিপ্লবী এই খণ্ডযুদ্ধ এবং অন্যান্য অভিযানে নিহত হন। বিপ্লবীরা গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালে সংক্ষিপ্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ই জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাও ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯০০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিঙ্কশন নিয়ে বি.এ. পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রীতিলতাকে তাঁর যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তাঁর সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন।

কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পাশাপাশি কোলকাতায় যুগান্তর দলও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই বছর ডিসেম্বরে এক অভিযানে নিহত হন কোলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন। এর আগে বিনয় বসুর হাতে নিহত হন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার লোম্যান। এই বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে জড়িত বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করেন এবং দীনেশের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত বীণা দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মেদিনীপুরে পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়।

চিত্র-৬০ : প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বিপ্লবীদের ব্যাপক তৎপরতা কমে গেলেও চট্টগ্রামে তারা এর পরও একের পর এক অভিযান চালিয়েছে। ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের পল্টন ময়দানে ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার আয়োজনে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে সক্ষম হয়। ঐদিনও দুজন বিপ্লবী নিহত হন এবং দুজন ধরা পড়লে তাদের পরে হত্যা করা হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ইচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা। এই আন্দোলন পরিচালিত হতো গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছুসংখ্যক শিক্ষিত সচেতন যুবক। নিরাপত্তার কারণে সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গোপনে পরিচালিত হতো। সাধারণ জনগণের এ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। সাধারণ মানুষের কাছে সশস্ত্র আক্রমণ, বোমাবাজি, হত্যাকাণ্ড সবই ছিল আতঙ্ক আর ভয়ের কারণ। ফলে সাধারণ মানুষ ছিল এদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

গুপ্ত সংগঠনগুলোকে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হতো। সব দল সব বিষয়ে জানতে পারত না। ফলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ কারণে অনেক সময় সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কোনো অভিযান সফল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমন্বয়ের অভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয়। তাছাড়া গুপ্ত সমিতিগুলো যার যার মতো করে কাজ করত। এক সমিতির সঙ্গে অন্য সমিতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ফলে সশস্ত্র বিপ্লবে কোনো একক নেতৃত্ব না থাকায় সারা দেশে আন্দোলন চলে বিচ্ছিন্নভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া সরকারের কঠোর দমননীতি ও জনবিচ্ছিন্নতার কারণে বিপ্লবীরা নিরাশ্রয় এবং কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সংগঠন ও নেতাদের মধ্যকার আদর্শের বিরোধ-বৈরিতা যেমন সশস্ত্র বিপ্লবকে দুর্বল করেছিল, তেমনি তাদের মধ্যে তীব্র বিভেদের জন্ম দিয়েছিল। এ অবস্থায় বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হলে অনেক বিপ্লবী এতে যোগদান করেন।

সশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম, সাহস পরাধীন বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল। এ আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে সফল না হলেও বিপ্লবীদের আদর্শ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

একক কাজ : ১. বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
২. 'প্রীতিলতার জীবন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড' একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

স্বরাজ ও বেঙ্গল প্যাক্ট

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা চিত্তরঞ্জন দাস (সি.আর. দাস) ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়।এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সি.আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ পার্টি। সি.আর. দাস হন এ দলের সভাপতি। মতিলাল নেহরু হন অন্যতম সম্পাদক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যাঁরা স্বরাজ লাভের জন্য স্বরাজ পার্টির সমর্থক ছিলেন, তাঁদেরকে পরিবর্তনপন্থি এবং যাঁরা স্বরাজ পার্টির বিপক্ষে অংশ নেন তাঁদের বলা হয় পরিবর্তনবিরোধী। এই দুই পক্ষের সঙ্গে শুধু আন্দোলনের পন্থা নির্ধারণের ধরন ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বিরোধ ছিল না।

স্বরাজ দলের বিরোধীরা অসহযোগ আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে আইন বয়কট করার সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। অন্যদিকে স্বরাজ দল গঠনের পরপর বাংলার অনেক বিপ্লবী–সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এতে যোগদান করেন।

স্বরাজ দলের কর্মসূচি

১. আইনসভায় প্রবেশ করে সরকারি কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা এবং ১৯১৯ সালে প্রণীত সংস্কার আইন অকার্যকর করে দেওয়া;

২. সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান করা এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো;

৩. বিভিন্ন প্রস্তাব ও বিল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে জোরদার করা এবং

৪. বিদেশি শাসনকে অসম্ভব করে তোলা।

স্বরাজ দলের কার্যাবলি

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী, ১৯২৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাজ দল তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে বাংলা ও মধ্য প্রদেশে স্বরাজ দল এ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানদের সমর্থন লাভের কারণে আইন সভায় স্বরাজ দলের ভিত শক্ত হয় এবং কর্মসূচি অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। বাংলায় স্বরাজ দলের অভূতপূর্ব বিজয়ের কৃতিত্ব ছিল দলের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা, উদারনীতি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন তাঁকে এবং তাঁর দলকে শক্তিশালী করে তোলে।

বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি (ডিসেম্বর, ১৯২৩ সাল)

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করার জন্য তিনি যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে তা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে খ্যাত। তাঁর এই প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সি.আর. দাস ফর্মুলা নামে খ্যাত বাংলা চুক্তি সম্পাদনা করতে যেসব মুসলমান নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আব্দুল করিম, আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। এ ছাড়া, স্যার আব্দুর রহিম, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনে সহযোগিতা ও এতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। অপরদিকে বাংলার কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্ত ছিল।
যেমন :

১. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে এ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হবে।

২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০টি আসন পাবে।

৩. সরকারি দপ্তরে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে।

৪. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশে সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

৫. মসজিদের সামনে গান-বাজনাসহ কোনো মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

একক কাজ : বেঙ্গল প্যাক্টে অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে প্রতিফলন ঘটেছে তার ধারাগুলো পরপর সাজাও।

বেঙ্গল প্যাক্টের অবসান

বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের দলিল ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি। এই চুক্তির কারণেই মুসলমানের আস্থা অর্জন করে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়। অপরদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোলকাতার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং মুসলমানরা কর্পোরেশনে চাকরি লাভে সক্ষম হয়। বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সি. আর. দাসের এই পদক্ষেপ যেমন বাস্তবধর্মী ছিল তেমন ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে থাকতেই হিন্দু পত্রিকাগুলো, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ, গান্ধীজির সমর্থক কংগ্রেস দল ও স্বরাজ দলবিরোধী হিন্দুরা 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর তীব্র বিরোধিতা করে।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অকালমৃত্যুতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া কংগ্রেস এবং অন্য নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর বিষয়ে উদাসীন থাকেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে কোলকাতা এবং পরে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নষ্ট হলে এই চুক্তি বাস্তবায়নের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

একক কাজ : কার মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়? এই ঐক্যের জন্য তাঁর কাজের তালিকা প্রস্তুত কর ।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে। নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত রিপোর্টটিতে যে সুপারিশ করা হয় তা হলো– ভারতের জন্য স্বাধীনতার পরিবর্তে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান, দায়িত্বশীল সরকার গঠন, সিন্ধু ও কর্ণাটক প্রদেশ সৃষ্টি। এছাড়া বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভায় সংরক্ষিত আসন প্রথা বিলোপ সাধন। নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের প্রথা অবসানের সুপারিশ করায় মুসলিম নেতারা দলমত নির্বিশেষে এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে নেহরু রিপোর্টের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯২৯ সালে তার বিখ্যাত ১৪ দফা উত্থাপন করেন। এর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল হতে থাকে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সব রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩০-১৯৩২ সাল পর্যন্ত লন্ডনে আহূত পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের দাবির বিষয়ে একমত হতে না পারার কারণে সমঝোতা ছাড়াই পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সমস্যা সমাধানের জন্য 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে মুসলমানরা প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের বৈশিষ্ট্য সংবলিত ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এই আইন ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও এই আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। কারণ জিন্নাহ এবং কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এর তীব্র সমালোচনা করেন।

অপরদিকে হিন্দু মহাসভা এই আইনের বিরোধিতা করে। দলগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে এই আইনের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। অপরদিকে প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। এ অবস্থায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু নির্বাচন পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন যে, ভারতে দুইটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়–একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। তাঁর এ ধরনের মন্তব্য মুসলিম নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জিন্নাহ যিনি দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তিনি কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যের কারণে রাজনীতির ভিন্ন পথে অগ্রসর হন। ১৯৩৮ সালে তিনি সিন্ধুতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতি বলে উল্লেখ করেন। এভাবে লাহোর প্রস্তাবের আগেই হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি–এই চিন্তা করার ফলে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তারও প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই প্রকাশের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের অনেক আগেই ১৯৩০ সালে কবি আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা অঙ্কন করেন। ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনের পরে বিজয়ী কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যে তিনি বুঝতে পারেন যে, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দু নেতৃবৃন্দের শাসনাধীনে বাস্তব রূপ লাভ করবে না। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ্ তাঁর বহুল আলোচিত-সমালোচিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোষণা দেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মূলত তার এই ঘোষণার বাস্তব রূপ দেওয়ার পথনির্দেশ করে।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। এ কে ফজলুল হক ২৩শে মার্চের অধিবেশনে তাঁর রচিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর হবে না, যদি এটি লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

চিত্র-৬১ : শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারাসমূহ—

ক. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

গ. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের সব অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় এটিকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান একটি 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশনে নীতিবহির্ভূতভাবে জিন্নাহ্ 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে, লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ধারার জন্ম হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের নামে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। সে অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জনসম্মুখে আসে।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭ সাল)

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু এবং ১৯২৬ সালে কোলকাতার দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ, তমিজউদ্দিন খান প্রমুখ মুসলিম নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

১৯২৯ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের পর 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। ফলে কৃষক আন্দোলন ও রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

পরবর্তী বছর এর নতুন নামকরণ হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি'। কৃষক প্রজা পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং প্রদেশ পর্যায়ে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৩৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কোনো দল এককভাবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ কে ফজলুল হক কংগ্রেসের সাথে সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতবিরোধের কারণে ১৯৪১ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকায় ঐ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ নতুন মন্ত্রিসভা ছিল বহুদলের সমাবেশ। এরূপ একটি মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ফজলুল হক বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। এই নতুন ধারা ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৪৩ সালের ১৩ই এপ্রিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সর্বনাশা এ দুর্ভিক্ষে বাংলার ৩০ লক্ষাধিক লোক মৃত্যুবরণ করে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৪৫ সালে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪ আসনে জয়লাভ করে। এতে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সুস্পষ্ট সমর্থনের প্রতিফলন ঘটে।

১৩৫ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ও নির্বাচনের ফল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ সালের

২৪শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সময় ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশ বিভাগের রাজনৈতিক পরিবেশে কোলকাতার দাঙ্গা ও স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগ ছিল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। এরকম চরম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাস 'বসু-সোহরাওয়ার্দী' প্রস্তাব নামে খ্যাত।

১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন-সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

চিত্র-৬২ : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি

১৯৪৭ সালের ২০শে মে কোলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, এ. এম. মালেক প্রমুখ নেতা। অপরদিকে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বখসী। সভায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে তা সে নিজেই ঠিক করবে।

২. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।

৪. সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে।

৫. সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের ব্যর্থতা

অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল নেতারা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও এই প্রস্তাবের প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কট্টরপন্থি হিন্দু নেতাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যায়। ফলে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল নেতারা প্রথম দিকে এর সমর্থক হলেও পরে তারা অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার দাবি জানাতে থাকেন। ফলে বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়।

প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব অর্থাৎ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব প্রথম থেকেই কংগ্রেসের উঁচু পর্যায়ের নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলসহ বহু নেতা এর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কোনোমতেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কোলকাতাকে হাতছাড়া করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাছাড়া পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসামও তাঁদের প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ যুক্ত বাংলার চরম বিরোধী ছিলেন। ফলে যুক্ত বাংলা প্রস্তাব কংগ্রেসেরও সমর্থন হারায়। এ রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ১৯৪৭-এর আইন অনুসারে ভারত ভাগ হয়। ১৪ই আগস্ট জন্ম হয় পাকিস্তান নামের মুসলিম রাষ্ট্রের। আর ১৫ই আগস্ট জন্ম হয় আরেকটি রাষ্ট্রের, যার নাম হয় ভারত। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়- পরবর্তীকালে যা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে, পশ্চিম বাংলা যুক্ত হয় ভারতের সঙ্গে। এভাবেই হাজার বছরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় পথচলা এক বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বাংলা সংযুক্তি ও বিযুক্তির রাজনীতির কবলে পড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নও ব্যর্থ হয়ে যায়।

একক কাজ : যুক্ত বাংলার বিরোধীদের বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান কর।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান

ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পূর্ব কথা : ১৯৪২ সালে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারতে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজনীতিতেও নেমে আসে চরম হতাশা। তখন পৃথিবীব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণ আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের ভারত আক্রমণ পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তাঁর প্রেরিত প্রস্তাবে তিনি ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যেতে

বলেন। শুরু হয় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। গান্ধীজির ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমগ্র ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রবল ব্রিটিশবিরোধী রূপ নেয়। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এক ঘোষণায় বলেন 'আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাতের মধ্যেই, ঊষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই'।

কিন্তু ইংরেজ সরকার ঐ সময় কোনোভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং সরকার এই আন্দোলন দমন করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ঐ দিনই মধ্যরাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ– গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরুসহ অনেকে গ্রেফতার হন। সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাবন্দী হন।

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের খবরে অহিংস আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতাদের মুক্তির দাবিতে সর্বত্র হরতাল, কলকারখানা, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হতে থাকে। উত্তেজিত জনতা স্থানে স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলা, চলন্ত ট্রেনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, রেল স্টেশনে, সরকারি ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সারা ভারতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বা জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়। মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃদ্ধা জাতীয় পতাকা হাতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

এই আন্দোলনের সময় ১৯৪৩ সালে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। তাছাড়া দেশব্যাপী মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি–সব মিলিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হতাশ জনগণের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে।

একক কাজ : মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান কর।

যখন দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army (INA)। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেসে আপোসকামী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। প্রথম থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ছিল। কিশোর বয়স থেকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সুভাষ বসু ছিলেন গান্ধীর অহিংস নীতির বিরোধী। ১৯৩৭ সালে গান্ধীর অনুমোদনে কংগ্রেসের সভাপতি হলেও গান্ধীই আবার দ্বিতীয় দফায় তাঁকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেননি। তিনি সুভাষ বসুকে এ পদে নির্বাচন করতে নিষেধ করেন। সুভাষ বসু এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন এবং গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধীর প্রতি এই ধরনের চ্যালেঞ্জে জয়ী সুভাষ বসু পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হন। হতাশ হয়ে সুভাষ বসু কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। তাঁর রাজনীতি আপোসহীন পথে অগ্রসর হতে থাকে।

সুভাষ বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভীত ইংরেজ সরকার বারবার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত কারামুক্তি লাভ করে ১৯৪১ সালে সবার অলক্ষ্যে সুভাষ বসু দেশ ত্যাগ করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তিনি প্রথম

ইংরেজদের শত্রুভূমি জার্মানিতে গমন করেন। সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে লড়াই করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় ডুবোজাহাজে করে এক দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি জাপানে আসেন। সেখানে অবস্থানরত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহযোগিতায় জাপানে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। ১৯৪৩ সালে তিনি এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সরকারের সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিলেন ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। সুভাষ বসু কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতে ইংরেজ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এই দুঃসাহসী বাঙালির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। কোহিমা-ইম্ফলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে আজাদ হিন্দ ফৌজ এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ সালে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগের কারণে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমীর লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

সুভাষ বসু প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকার ছিল অসাম্প্রদায়িক। এই সরকার ও সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য মুসলমান অফিসার ও সেনাসদস্য ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপ্রধান শাহনাওয়াজ ছিলেন মুসলমান। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ বাঙালি নেতা সুভাষ বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত থাকলেও প্রকৃত সত্য এখনও গবেষণার বিষয়। ব্যর্থ হলেও নেতাজির অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। তিনি ব্রিটিশ-ভারতে দেশীয় সেনাসদস্যদের মধ্যে আনুগত্যের ফাটল ধরাতে যেমন সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি তাদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

দলীয় কাজ : দেশ স্বাধীনের জন্য নেতাজিকে কোন কোন দেশে যেতে হয় লিখ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ সালের বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব আলামত প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্তে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্রিটিশ সরকার একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে যুদ্ধ চলাকালীন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে সিমলায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল এক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে তীব্র মতবিরোধের কারণে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে। শ্রমিক দল ভারতের স্বাধীনতা দানের এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।

২০২৫

সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে নেতৃত্বে দ্বন্দ্বের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দীন ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীলদের নেতা। অপরদিকে আবুল হাশিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালিদের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীই বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মুসলমান তরুণ ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনি কর্মসূচি করে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন সভায় অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় প্রদান করে এবং মুসলিম লীগ নিজেকে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য এই নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ গরিষ্ঠ ভোট পায়নি। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের ভোটেই পাকিস্তান প্রস্তাব জয়ী হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তরুণ রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

নির্বাচন-উত্তর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচক্ষণ অ্যাটলি সরকার বুঝতে পারে যে, সম্মানজনকভাবে খুব বেশি দিন ব্রিটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৪৬ সালে ভারত সচিব পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয় ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।

মন্ত্রী মিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয় উল্লেখ করা হয়। যথা–

ক. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা।

খ. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা।

গ. হিন্দুপ্রধান গ্রুপ, মুসলমানপ্রধান গ্রুপ এবং বাংলা ও আসাম গ্রুপ– এ তিন ভাগে প্রদেশগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা। তবে শর্ত দেওয়া হয় যে, এ পরিকল্পনা গ্রহণ সার্বিকভাবে করতে হবে; অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হলেও মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কারণ মুসলিম লীগ মনে করে এই পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কংগ্রেস এ পরিকল্পনায় এককেন্দ্রিক সরকারের অখণ্ড ভারত গঠনের প্রতিফলন দেখতে পায়। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণে রাজি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগও তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে যায়।

বড়লাট ওয়াভেল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জহরলাল নেহেরু কর্তৃক মুসলিম লীগের স্বার্থবিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু বড়লাটের আহ্বানে নেহরু সরকার

গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিন ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে পাঠানো হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশ রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি এও ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের পূর্বেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই লন্ডনে কমন্স সভার এক ঘোষণায় ভারত-পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন, যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ সালে ১৮ই জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

দলীয় কাজ : 'ভারত স্বাধীনতা আইন'-এর মাধ্যমে কেন দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়—এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করেন কে?

ক. লর্ড কর্নওয়ালিস খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড চেমসফোর্ড ঘ. লর্ড রিডিং

২. মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল–

i. চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন
ii. স্বাধীন চিটাগাং সরকার এর ঘোষণা
iii. চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নিশাপুর চা বাগানে চা-শ্রমিকরা তাদের কম মজুরির প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছিল। অবরোধ ভাংচুর চালাতে থাকলে শ্রমিক নেতা কিরণ তাদের সহিংস আন্দোলন পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান।

৩. শ্রমিক নেতা কিরণ কোন ব্যক্তির নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন?

ক. ক্ষুদিরাম
খ. মাস্টারদা সূর্য সেন
গ. মহাত্মা গান্ধী
ঘ. পুলিন বিহারী দাস

৪. উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল—

i. হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দৃঢ়করণ
ii. নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
iii. সত্যাগ্রহ বন্দিদের মুক্তিদানের দাবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সালেহপুর ইউনিয়নটি নদীর তীরে অবস্থিত। গত বছর বন্যায় ফসল ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আয়তনে বড় হওয়ায় ত্রাণ তৎপরতাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে এই ইউনিয়নকে দুইটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়।

ক. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?
খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত কারণটিই কী বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ মনে কর? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. কেয়া ও কণা দুই বোন ঈদের কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। কেয়া তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি পণ্য রাখলেও কণা বিদেশি পণ্যকে পরিত্যাগ করে দেশি পণ্য কেনার পক্ষে মত দেয়। অবশেষে কণা তার বোন কেয়াকে দেশি পণ্য কেনার বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে দেশি পণ্য ক্রয় করে বাসায় ফেরে।

ক. দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেন কে?
খ. 'এনফিল্ড' রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলল কেন?
গ. কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহবোধ করেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে করো কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়? যুক্তি দাও।

একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) এবং ভারত (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) নামে দুটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তৎকালীন পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬% বাংলা ভাষী এবং ৩.২৭% উর্দু ভাষী ছিল। তবুও শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রথমেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। তাঁরা এই অন্যায় ও বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। এভাবেই পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ভাষার জন্য প্রতিবাদী আন্দোলনে পৃথিবীতে প্রথম শহিদ হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ অনেকেই। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সময়কালে বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচনা করেছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। যার প্রেরণায় দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করতে পারব;
- ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আগ্রহী হব;
- রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাব বিনিময়ে উৎসাহী হব এবং অপরকেও উৎসাহী করব;
- একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট এবং এর মর্যাদা বর্ণনা করতে পারব।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল ছিল না। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার ব্যবধানের পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) দুইটি ভূখণ্ডকে একটি দেশ করা হয় শুধু ধর্মের ভিত্তিতে। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। সে সময় মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত দেন। তখনই আবদুল হক ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ বাংলার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থী ও লেখকগণ এর প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন গঠিত হয় তমুদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশ করে। যেখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', যার আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়া। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ববঙ্গ বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক সংঘ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। সবকিছুকে উপেক্ষা করে ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করা হয়।

১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু, মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। ২৬ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২রা মার্চ দেশের শিক্ষার্থী বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বারের মতো 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটির আহ্বানে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল করার সময় পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকে আহত হন। শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩-১৫ই মার্চ আবার ধর্মঘট পালিত হয়। এবার শুধু ঢাকা নয়, দেশের সর্বত্র ধর্মঘট ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, বাঙালি সরকারি কর্মচারীরাও যোগ দেয় এ আন্দোলনে। তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৫ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপনসহ প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১শে মার্চ রমনার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন। দুটি বক্তব্যেই তিনি রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি অগ্রাহ্য করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা আবদুল মতিনকে অনুসরণ করে তীব্র প্রতিবাদে 'না না' ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা পূর্বের মতো এবারও 'না না' বলে প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর প্রতিবাদ করেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন পুনরায় সঞ্জীবিত হতে থাকে।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। দেশজুড়ে প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ চলতে থাকে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিন তার বক্তব্যে জিন্নাহর প্রতিধ্বনি করে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ মন্তব্যের স্ফুলিঙ্গই রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেয়, যা সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০শে জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করে। ৩১শে জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কর্ম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সভায় ৪ ও ২১শে ফেব্রুয়ারি নানা কর্মসূচি দেওয়া হয়। হরতাল, দেশব্যাপি জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ করেন। সরকারি এ ঘোষণা পাওয়া মাত্রই ঢাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা কিছুতেই ১৪৪ ধারা মেনে নিতে পারেননি।

২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এ সভায় ১৪৪ ধারা অমান্য করার প্রসঙ্গে দ্বিমত দেখা দেয়। অধিকাংশ সদস্য প্রথমে ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু আবদুল মতিন, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোহা, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বরে) ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে যোগ দেন। কতিপয় নেতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করে, তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

ছাত্র-ছাত্রীরাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয়ে গণপরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। আব্দুস সালাম ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ই এপ্রিল শহিদ হন। সে সময় গণপরিষদ বা সংসদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

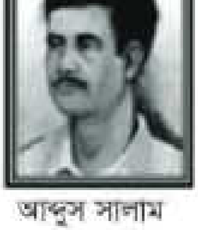
আব্দুস সালাম

আবুল বরকত

আবদুল জব্বার

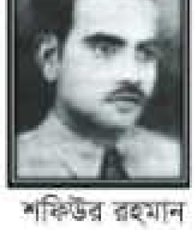
শফিউর রহমান

রফিকউদ্দিন আহমেদ

বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন।

যে স্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সেখানে ছাত্ররা সারা রাত জেগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

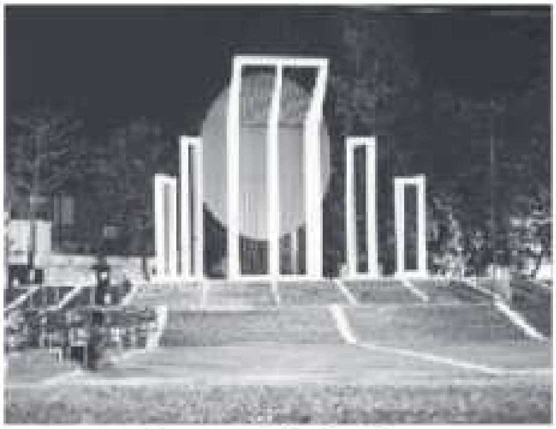

চিত্র-৬৩ : কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

তারপরও ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষা বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের একপর্যায়ে এর সদস্য আদেলউদ্দিন আহমদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিল পাস করা হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনে নারী

আটচল্লিশ ও বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে এদেশের তৎকালীন নারী সমাজের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মিছিল, স্লোগান, সভা-সমিতিতে তারাও পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন।

ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশেষ করে কামরুন্নেসা স্কুল এবং ইডেন কলেজের ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী। মিছিল-মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে নাদিরা বেগম, শামসুন্নাহার মাহমুদ, লীলা রায়সহ আরও অনেকে পোস্টার, ফেস্টুন লিখন এবং নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

ঢাকার বাইরেও নারী সমাজের ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং প্রতিবাদী। যশোরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হামিদা রহমান। বগুড়ায় বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুনসহ অনেকে। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদেরও ব্যাপক ভূমিকা ছিল। এ আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ আরও অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। এসব সংগ্রামী ভূমিকার পাশাপাশি ঐ সময় বিভিন্ন স্থানে নারীরা ভাষা আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করেন। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ, সাহেরা বানু উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও দুঃসাহসী ভূমিকা রাখেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙায় যাঁরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন, তারা হলেন শামসুন্নাহার, রওশন আরা, সুফিয়া ইব্রাহিমসহ অনেকে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম গ্রেফতার হলে পুলিশ-জনতার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষাশহিদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। একুশের প্রভাতফেরি ও প্রভাতফেরির গান বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। এদিন শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার-এ বসবাসরত Mother Language Lover of the World নামের একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ ১৯৯৮ সালের ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান-এর কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ২৭ ধারার উপর ভিত্তি করে তারা আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মাতৃভাষা ব্যবহার না করার জন্য, মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে; বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। যা 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ'-এর সরাসরি লঙ্ঘন। পত্রে তারা প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বাঙালির ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত পটভূমি তুলে ধরেন। যা সারাপৃথিবী জুড়ে অনন্য।

তারা ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। যাতে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ দিবস পাবে। এ আবেদনে বিভিন্ন ভাষাভাষী ১০ জন স্বাক্ষর করেন। ইউনেস্কো তথা জাতিসংঘ বাংলাদেশের প্রস্তাবটি মেনে নেয়। ২৮টি রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাবে লিখিতভাবে সমর্থন জানায় এবং Draft Resolution-35 হিসেবে চিহ্নিত করে এক্সিকিউটিভ বোর্ডে প্রেরণ করে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রকে দিবসটি উদ্‌যাপনের

জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে ১৯৫২ সাল থেকে যে ২১ শুধু আমাদের ছিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ভাষার জন্য বাঙালির আন্দোলন ও ত্যাগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পায় এবং বাংলাদেশের অহংকার বাংলা ভাষা আসন করে নেয় বিশ্বসভায়। ২০১০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাবিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি বা বাংলাভাষা শুধু বাংলাদেশের মানুষের কথা বলে না, কোনো একটি জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার কথা বলে না, সবার ভাষায় কথা বলে।

একক কাজ
১। ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।
২। শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলার কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

রাজনৈতিক তৎপরতা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব বাংলায় প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দল বা ধারা বিদ্যমান ছিল। ১. ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ, ২. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক ধারার দল জাতীয় কংগ্রেস, ৩. বিপ্লবী সাম্যবাদী ধারার কমিউনিস্ট পার্টি।

মুসলিম লীগ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নতুন নামকরণ হয় পাকিস্তান মুসলিম লীগ। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসক দল হিসেবে মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ ভুলে গিয়ে পাকিস্তানি মুসলিম লীগ নেতারা বাঙালির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, চালায় দমননীতি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমদের মতো মুসলিম লীগের ত্যাগী বাঙালি নেতারা উপেক্ষিত হন। শাসক দল হিসেবে মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে।

১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এ সময় দলটি। একটি ধারা ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিমপন্থী, অন্যটি ছিল খাজা নাজিমুদ্দীন-মওলানা আকরম খাঁপন্থি। প্রথম ধারাটি ছিল উদার, গণতান্ত্রিক, সংস্কারপন্থী এবং দ্বিতীয় ধারাটি ছিল রক্ষণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবহ। ফলে এ অন্তর্কোন্দল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংস্কারপন্থি ধারার নেতাদের সবসময় কোণঠাসা এবং দমন করার চেষ্টা করত।

মুসলিম লীগের এই ভ্রান্তনীতির কারণে দেশে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার উন্নতির দিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাত করত না। পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ ক্রমেই প্রকট হতে থাকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি– প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বৈষম্য ছিল লক্ষণীয়। ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন দ্রুত কমতে থাকে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ

দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগের যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সংস্কারপন্থি ছিল তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নানাভাবে দমন-নিপীড়ন চালাতে থাকে। দেশ শাসনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জনগণ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বঞ্চিত নেতাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়তে

থাকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অনেকে মুসলিম লীগের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

এ পর্যায়ে ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন নামের একটি বাড়িতে কর্মী সম্মেলন হয়। ৩০০ জন শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। সভায় সর্বসম্মতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকার আরমানিটোলায় ২৪শে জুন সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪ সাল)

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। আগে থেকেই ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় নানা টালবাহানা করে নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। অবশেষে সরকার পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টি, ৪. হাজী দানেশের বামপন্থি গণতন্ত্রী দল ও ৫. খিলাফত-ই-রাব্বানি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা'। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে প্রণীত এই ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। প্রধান দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো :

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা;
৩. পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা;
৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা;
৫. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা;
৬. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান;
৭. '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ;
৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা;
৯. ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান;
১০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা;
১১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২রা এপ্রিল সরকারিভাবে নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তারা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় সহযোগীদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ও বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ খুঁজতে থাকে যেকোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করতে। এমতাবস্থায় মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। একই সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে, তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারা বলে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। এ শাসন ১৯৫৫ সালের ২রা জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। মাত্র ৫৬ দিনের শাসনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান হয়। মূলত মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে কোন্দলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি।

একক কাজ : ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভূমিকা চিহ্নিত কর।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি ওঠে। পূর্ব বাংলা থেকে এ দাবি ছিল আরও জোরালো। পূর্ব বাংলার জন-দাবিই ছিল নতুন সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন অর্জিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করতে চাইল। প্রথম অবস্থায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কাজ করা এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনীহায় গণপরিষদের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ কর্তৃক একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এ মূলনীতি কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ছিল নগণ্য। সময়ক্ষেপণ করে মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তার সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এ কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে এবং তারা কমিটির সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে যায়। অবশেষে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। পশ্চিম ও পূর্ব অংশের নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন। তারই ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান দুই বছর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইসকান্দর মির্জা সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কার নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়?

ক. ড. কাজী মোতাহার হোসেন খ. অধ্যাপক আবুল কাশেম

গ. জনাব আবুল মনসুর আহমদ ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

২. ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়–

i. ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য

ii. পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তির জন্য

iii. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রতিবাদ জানাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

টেলিভিশনে লোকজ গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। মিথিলা বেশ আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিল। কিন্তু তার ছোট ভাই মিঠুন কেবলই চ্যানেল পরিবর্তন করে ইংরেজি কার্টুন দেখতে চেষ্টা করছিল। মিঠুনের মতে ঐসব গানের শ্রোতা হচ্ছে গ্রামের লোক। তার বোনের এসব গানপ্রীতি বেমানান লাগে।

৩. মিথিলা কোন আন্দোলনের চেতনায় অনুপ্রাণিত?

ক. অসহযোগ আন্দোলন খ. খিলাফত আন্দোলন

গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. স্বাধিকার আন্দোলন

৪. উক্ত চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিথিলা হতে পারে—

i. দেশপ্রেমিক

ii. জাতীয়তাবাদী

iii. প্রতিবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সবুজনগর অঞ্চলের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবেলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট ছোট দল একতাবদ্ধ হয়। তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের ওপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা চরমভাবে পরাজিত হন।

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

খ. 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গড়ে তোলা হয় কেন?

গ. সবুজনগর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না'—পাঠ্যপুস্তকে পঠিত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনের মেসেজে ইংরেজি অক্ষরে 'SHUVO JONMODIN' কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠা ডেভিড তার বন্ধুর কাজটিকে সমর্থন করেনি। সে ইংরেজিতে জন্মদিনের প্রচলিত মেসেজে 'HAPPY BIRTHDAY' আশা করেছিল।

ক. ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন?

খ. ১৯৪৯ সালের পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি কেন গঠিত হয়?

গ. পলাশের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়? যুক্তি দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮-১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসনব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া এর সাথে যুক্ত হয় সেনাবাহিনীর প্রভাব। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেনাবাহিনী শাসনক্ষমতা দখল করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। তার সময়কালে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব রাখতে শুরু করে। ইস্কান্দার মির্জা নানাভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেন। তার ষড়যন্ত্রে কয়েকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পতন হয়। পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে বিরোধী দল কৃষক-শ্রমিক পার্টির আক্রমণে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মাথায় আঘাত পেয়ে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতা ইস্কান্দার মির্জার পক্ষে সেনাশাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে সৃষ্ট পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ৬ দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১১ দফা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দেশের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। এর কিছুদিনের মধ্যে ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন।

তার এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে একধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের আদেশ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন

থেকে উচ্চ পর্যন্ত স্তরগুলো ছিল : (১) ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তানে), তহসিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকত।

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি মেম্বার ছিল। জনগণের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা ছাড়া কোনো দায়িত্ব ছিল না। বিডি মেম্বার ছিল প্রকৃত নির্বাচক। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

একক কাজ : আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের একটি ধারণা কাঠামো প্রস্তুত কর।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ খবর পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১লা ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকে এবং মিছিল বের করে। একনাগাড়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট চলে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ৭ই ফেব্রুয়ারি সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ছাত্রদের ওপর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু হয়। ১লা মার্চ আইয়ুব খান নতুন সংবিধান ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। শিক্ষার্থীদের নতুন সংবিধানবিরোধী এ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদদের অনেকে সমর্থন ব্যক্ত করেন। আইয়ুব খান ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালায়।

১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ প্রতিবেদনের সুপারিশে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে কঠোর আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত এবং কয়েক'শ আহত হয়। এ আন্দোলনের ফলে শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক আইন স্থগিত করা হলে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরে আসে। আইয়ুব খান নিজেই কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আইয়ুববিরোধী মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান। ফলে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। খুব তাড়াতাড়ি এ ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেন। ১৯৬৪ সালের শুরুতেই আওয়ামী লীগ এনডিএফ থেকে বেরিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন এবং এনডিএফ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একটি জোট বা COP (Combined Opposition Party) গঠন করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে কপ-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পূর্ব থেকেই আইয়ুব খান নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন। জনগণ ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। সেখানেও আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিলে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে বৈরিতার সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান—উভয়ই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। ১৯৪৭ সালেই তাদের মাঝে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ বাধে। কিন্তু জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে তার অবসান হয়। কাশ্মীরকে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরি নেতা শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করা হলে ভারতের কাশ্মীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য দেখিয়ে লাহোরের দিকে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানিদের এই চরম দুর্দিনে বাঙালি সেনারা অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে লাহোর রক্ষা করেন। পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার মুখে পাশ্চাত্য শক্তি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে ১৭ দিনের মাথায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান হয়।

এ যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী মনোভাব প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। অরক্ষিত এ অঞ্চল যেকোনো সময় ভারতের আক্রমণের শিকার হতে পারত। এমনকি এ সময় প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাঙালি সেনারা জীবনবাজি রেখে লাহোর রক্ষা করলেও আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। লাহোর প্রস্তাবে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও পাকিস্তানি শাসকরা প্রথম থেকেই এ বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করে। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের মাধ্যমে তারা দেশ শাসন করতে থাকে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শোষণ চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ঘটায়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর দমন-নিপীড়ন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ অচল করে রাখে। বারবার শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলার জাতীয় নেতাদের অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি করে রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায়

বাঙালি প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল খুবই কম। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সরকারকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করে। পরবর্তী মন্ত্রিসভাগুলোকে বারবার ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য অচল করে রাখে। অবশেষে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তারা। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১১৯ জন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০। ১৯৪৭ সালে করাচিকে রাজধানী করায় সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপক হারে চাকরি লাভ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল উচ্চপদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সরকারের সব দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালির পক্ষে সেখানে গিয়ে চাকরি লাভ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের সাফল্য সহজ ছিল না।

সামরিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক শাসনের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল সামরিক বৈষম্য। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। প্রথম থেকেই সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদ পাঞ্জাবিরা দখল করে রেখেছিল। তারা বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে দূরে রাখার নীতি গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং মাত্র ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাঙালির দাবির মুখে সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তা ছিল নগণ্য। ১৯৫৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, সামরিক বাহিনীর মোট ২২১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৮২ জন। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। আইয়ুব খানের শাসনামলে মোট বাজেটের ৬০% সামরিক বাজেট ছিল। এর সিংহভাগ দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রতি অবহেলা দেখানো হতো।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে কখনও মূলধন গড়ে ওঠেনি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনা প্রণীত হতো কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার থেকে

২০১৮

বঞ্চিত করত। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি, দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫০ কোটি রুপি এবং ১৩৫০ কোটি রুপি। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। রাজধানী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫৬ সালে করাচির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় ৫৭০ কোটি টাকা, যা ছিল সরকারি মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল ৫.১০%। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদ নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা, আর ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় করা হয় ২৫ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে কাঁচামাল সস্তা হলেও শিল্প-কারখানা বেশিরভাগ গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও তার অধিকাংশের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। ফলে শিল্পক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্ভরশীল থাকতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর। পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বর্ণ এবং টাকা-পয়সা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বর্ণ ও টাকা-পয়সা পূর্ব পাকিস্তানে আনার ওপর সরকারের বিধিনিষেধ ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে-প্রাণে চেয়েছিল—পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি যেন শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকে। অথচ তারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার উন্নয়নের কোনো চেষ্টাই তারা করেনি। এছাড়া বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম করা বা আরবি ভাষায় বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় আঘাত হানতে চেয়েছিল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্য দেখানো হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি। পাকিস্তানের সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির ৩০টি পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং মাত্র ৫টি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

সামাজিক বৈষম্য

রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করত। সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সুবিধা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেত। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

দুই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬%। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অপরদিকে ৪৪% জনসংখ্যার পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। উর্দুভাষী ছিল মাত্র ৩.২৭%। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা ও সুসমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং বাংলা ভাষাকে উর্দু বর্ণে লেখানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নাটক, সাহিত্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত হানার জন্য রবীন্দ্রসংগীত ও রচনাবলি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা অসাম্প্রদায়িক কবিতার শব্দ, চরণ বদল করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনকে হিন্দু প্রভাব বলে উল্লেখ করে সেখানেও বাধাদানের চেষ্টা করা হয়।

দলীয় কাজ : সামরিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যের লেখচিত্রে প্রকাশ কর।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। ৬ দফা ছিলো মূলত ছাত্রদের ১১ দফা ও ২১ দফারই সারসংক্ষেপ, যা বৈষম্য ও অবহেলার সমাপ্তি ঘটাতে তৈরি হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু লাহোর পৌঁছান। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু সম্মেলন বর্জন করেন এবং ছয় দফা সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটো পৃথক মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

অথবা

দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুদ্রা ও মূলধন পাচার হতে না পারে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চিত্র-৬৬ : ঢাকার রাজপথে ছয় দফার পক্ষে মিছিল

৪. সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ দ্বারা ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।
৫. বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে।
৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয় দফার গুরুত্ব

১৮-২০ শে মার্চ, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৩২টি জনসভায় বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। আইয়ুব সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ধরপাকড় শুরু করে। আইয়ুব খান এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে এসে বিভিন্ন জনসভায় ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন। দিনে দিনে ছয় দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবকে ১৯৬৬ সালের ৯ই মে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় মিছিলে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৮ই জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করে ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নির্বাচনের মূল ইশতেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। তথাপি ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জনমানুষের দাবিতে পরিণত হয়। এ পটভূমিতে পাকিস্তান সরকার নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রচারণায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত হয়।

এ মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন ৩৫ জন। মামলায় শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করা হয়। সাথে অভিযুক্ত অন্য ৩৪ জন হলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এল.এস. সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, এ.বি.এম. আবদুস সামাদ, হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী), বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, হাবিলদার মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এ.বি.এম. খুরশিদ, খান শামসুর রহমান সিএসপি, রিসালদার এ.কে.এম. শামসুল হক,

হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারি, সার্জেন্ট সামসুল হক, মেজর ডা. শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এ. এস. এম. নুরুজ্জামান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম.এম.এম. রহমান, সুবেদার এ.কে.এম. তাজুল ইসলাম, মো. আলী রেজা, ক্যাপ্টেন ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বেলা এগারোটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। বিচারকাজ চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ ১৯৬৯ সালে এসে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে নতি স্বীকার করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল অভিযুক্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে একটি বিশাল সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খান শামসুর রহমান সিএসপি, রিসালদার এ.কে.এম. শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারি, সার্জেন্ট সামসুল হক, মেজর ডা. শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এ. এস. এম. নুরুজ্জামান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম.এম.এম. রহমান, সুবেদার এ.কে.এম. তাজুল ইসলাম, মো. আলী রেজা, ক্যাপ্টেন ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বেলা এগারোটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। বিচারকাজ চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ ১৯৬৯ সালে এসে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে নতি স্বীকার করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল অভিযুক্ত ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে একটি বিশাল সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১১ দফা আন্দোলন

১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলে আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) কার্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এ কর্মসূচি শুধু ছাত্রদের নয়, আপামর জনগণের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। ১১ দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে ছিল– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের

ন্যায্য মজুরি প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, জরুরি আইন, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি ইত্যাদি।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে, তা একসময় ছড়িয়ে পড়ে শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবারের মতো একসাথে আন্দোলনে নামে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে সেগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছিল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

চিত্র-৬৭ : ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল সেইদিন

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ই ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি যৌথ কর্মসূচি হিসাবে পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট মিছিল গভর্নর হাউস ঘেরাও করে। সেখানে মিছিলকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হলে মওলানা ভাসানী ঢাকা শহরে হরতাল আহ্বান করেন। ৮ই ডিসেম্বর প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ২৯শে ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগের ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১ দফা দাবি পেশ করে। উনসত্তরের উত্তাল সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই ১১ দফা দাবি ছিল খুবই সময়োপযোগী। ফলে দ্রুত এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক মোর্চা গঠন করে এবং ৮ দফা দাবি পেশ করে।

চিত্র-৬৮ : পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ ছাত্রনেতা আসাদ

এরপর থেকে 'ডাকসু' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। ডাকসুর আহ্বানে ১৪ই জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১৮ই জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২০শে জানুয়ারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করেন। হরতাল পালনকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে সারা দেশে হরতাল চলাকালে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঢল নামে। মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন যেন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

আবারও পুলিশের গুলিতে নবম শ্রেণির ছাত্র কিশোর মতিউর নিহত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঢাকা শহর সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৪শে জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহু মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিকেলে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা দেন, 'দুই মাসের মধ্যে ১১ দফা বাস্তবায়ন ও রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেল ভেঙে মুজিবকে মুক্ত করে আনব।' অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে আইয়ুব খানবিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলে নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আইয়ুব খান বুঝতে পারেন, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি না দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের চাপে ২১শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা দেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না।

২৬শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা বার বার ব্যর্থ হতে থাকে। পুরো দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে মোট ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ই মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ২২শে মার্চ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করেন। তাতেও গণআন্দোলন থামানো যায়নি। ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন?

ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ　　খ. ইস্কান্দার মির্জা

গ. আইয়ুব খান　　ঘ. মালিক ফিরোজ খান

২. আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কারণ—

i. দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার

ii. ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতন

iii. আইয়ুব খান কর্তৃক নতুন সংবিধান ঘোষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অগ্রণী ক্লাবের সভাপতির একরোখা মনোভাব ও অসহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ক্লাবের সদস্যগণ। মারুফ সাহেবের নেতৃত্বে সদস্যগণ তাঁদের দাবি-দাওয়া সভাপতির নিকট পেশ করেন। সভাপতি ও তাঁর পক্ষের লোকজন বিষয়টিকে অযৌক্তিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মারুফ সাহেব ও তার অনুসারী সদস্যবৃন্দ সোচ্চার হন।

৩. মারুফ সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

ক. ছয় দফা দাবি উত্থাপন　　খ. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন

গ. আইয়ুববিরোধী আন্দোলন　　ঘ. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন

৪. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই—

i. আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে

ii. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়

iii. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	১১৯ জন	৯৫৪ জন
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা	২৯০০ জন	৪২০০০ জন
গেজেটেড কর্মকর্তা	১৩৩৮ জন	৩৭০৮ জন
নন-গেজেটেড কর্মকর্তা	২৬৩১০ জন	৮২৯৪৪ জন

ক. ১৯৬৫ সালে কাকে COP-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়?

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকে পাকিস্তানি আমলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বৈষম্যই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একমাত্র কারণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. রফিক একটি চলচ্চিত্র দেখছিল। ছবিতে একটি অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের জনগণের সাহস, বুদ্ধি ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সরকারের একপেশে নীতির কারণে সংসদে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই। তারা চাকরি, শিক্ষা ও অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত। তাদের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এক আপোসহীন নেতা। তিনি জনগণের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন সভা গঠন, রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইত্যাদি উক্ত অঞ্চলের হাতে দেওয়ার দাবি জানান।

ক. কার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়?

খ. মতিউর হত্যার প্রেক্ষাপট কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর কোন কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত দাবিনামা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল? যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সামরিক শাসক যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও নেতৃবৃন্দের ওপর একের পর এক নিপীড়নমূলক আচরণ করে, তখনই এদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। যার পরিণতি ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানে ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তার উত্তরসূরি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। তিনি ঘোষণা করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করে। একপর্যায়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করে এবং শেষ পর্যায়ে এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ করে। শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ। ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ শত্রুর দখলমুক্ত হয়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীনতা ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ–বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জাতীয় পতাকা তৈরি এবং এর ব্যবহার কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্ধারণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হব।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জেনারেল আইয়ুব খান গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের আরেকজন সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ঐ সব এলাকায় ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আইনগত কাঠামো আদেশ

ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে নির্বাচনসংক্রান্ত আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি মূলত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত হবে, ভোটদানের প্রক্রিয়া কী হবে, কত দিনের মধ্যে নির্বাচিত পরিষদ সংবিধান রচনা করবে এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরেন। তার ঘোষণার বিশেষ দিকগুলো ছিল :

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, যা ১লা জুলাই ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. ১৩ জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ হবে, আর ৬২১ জন সদস্য নিয়ে হবে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ।

পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন

অঞ্চল	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পশ্চিম পাকিস্তান	১৩৮	৬	১৪৪	৩০০	১১	৩১১

৩. নির্বাচনে এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হয়।

৪. পাকিস্তানের দুই অংশের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্ধারণ করবেন।

৫. ভোটার তালিকা ১৯৭০ সালের জুন মাসের মধ্যে তৈরি হবে।

৬. সংবিধান রচনার জন্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ দিনের সময় ধার্য করে দেন। এ সময়ের মধ্যে কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙে নতুন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে বলা হয়, সংবিধান রচনা এবং সংবিধানকে সত্যায়িতকরণ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে। নির্বাচনের নির্দেশনাবলির পাশাপাশি সংবিধানের ভিত্তি সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আইনগত কাঠামো আদেশের ২০ নং ধারায় সংবিধানের মূল ছয়টি নীতি বেঁধে দেওয়া হয়। যথা :

ক. ফেডারেল পদ্ধতির সরকার;

খ. ইসলামি আদর্শ হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি;

গ. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন;

ঘ. মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

ঙ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করতে হবে;

চ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশে মূলত সার্বভৌম পার্লামেন্টের বদলে একটি দুর্বল পার্লামেন্টের রূপরেখা দেওয়া হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো এর সমালোচনা করে। তারা এ আদেশের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেওয়ার দাবি জানায়।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

১৯৬৯ সালের ২রা জুলাই ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ ছিল একটি সর্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। এ তালিকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ২,৫২,০৬,২৬৩ জন। এ ভোটার তালিকায় ভিন্ন জাতিসত্তার নৃগোষ্ঠী অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমমনা দলগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এককভাবে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করে। মোট ৭৮১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেন। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ছিল ১৭০ জন প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়াতুল উলামা ও নেজামে ইসলাম, ইসলামী গণতন্ত্রী দল, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) প্রভৃতি। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-সহ কিছু দল এই নির্বাচন বর্জন করে।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সে সময় জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এমএনএ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এমপিএ বলা হতো। ভোটের ফলাফল মূল্যায়নে দেখা যায়, মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। নির্বাচনের এমন ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে।

চিত্র-৬৯ : '৭০-এর নির্বাচনের সাফল্যে সহকর্মী পরিবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়া ছিল আইনসম্মত। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করেন। তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে জনতা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। সারাদেশে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে বহু লোক

২০১৮

নিহত ও আহত হয়। ঐদিন ছাত্রলীগের নেতারা 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ২রা মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের সমাবেশে ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। এতে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ছাত্রদের এ ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা আপামর জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে হরতাল পালন করে। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করেন। ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবীরা তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ তিন দিনের হরতালে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ইয়াহিয়া খান এ পরিস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অগত্যা ৬ই মার্চ বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তবে তার ঘোষণা বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সামরিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করা হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ একমাত্র জাতীয় নির্বাচন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার বিজয় অর্জিত হয়। এছাড়া পূর্বাঞ্চলের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি করে আসছিল, তা পশ্চিমাঞ্চলের সরকার অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এ নির্বাচনের ফলাফলে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এলে তিনি তা না করে নিরীহ বাঙালির ওপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম, যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সামরিক সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রেক্ষাপটে বাংলার মানুষের মুক্তির আন্দোলন আরো বেশি প্রকাশিত হতে শুরু করে। সারা দেশে নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক হয়ে আছে। ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে অনেকগুলো বিষয় উপস্থাপন করেন। এগুলো হলো :

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মানুষের মুক্তির দিকনির্দেশনা;

২. যুদ্ধের রণকৌশল বর্ণনা;

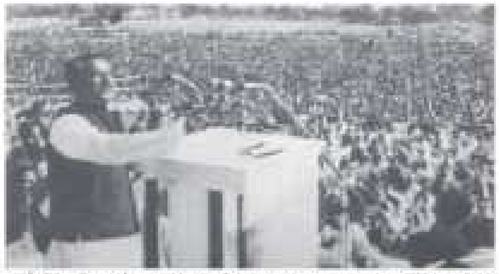

চিত্র-৭০ : ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দানরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার;
৪. গণহত্যার তদন্ত করা এবং
৫. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

এর বাইরে আরও বেশ কিছু দাবি ভাষণে উত্থাপন করা হয়। তিনি বাংলাদেশের সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশও দেন এবং দেশকে স্বাধীন করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। তাঁর এ ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়, যা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে। ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের '১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ'কে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, ইউনেসকো (UNESCO)।

অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ১০ই মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর পরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৩ই মার্চ সরকার পুনরায় সামরিক আইন জারি করে। ১৪ই মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। তবে বঙ্গবন্ধু এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ঐ দিনই ৩৫ দফাভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন। সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকা সফরে আসেন। এখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু আলোচনার জন্য রাজি হলেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৬ই মার্চ থেকে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা শুরু হয়। এরপর ২২শে মার্চ হঠাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। এর মধ্যে ১৯শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা চালালে এর প্রভাবে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে এদেশের ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। তার আগে তিনি সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিয়ে যান।

২৫শে মার্চের গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধ

চিত্র-৭১ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম এবং একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'।

চিত্র-৭২ : মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৮ই মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করেন। ১৯শে মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়। ২০শে মার্চ সরকার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। ঐ দিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার সামরিক উপদেষ্টা হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পিরজাদা, জেনারেল ওমর প্রমুখকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এ সময় প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পিআইএ ফ্লাইট বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও রসদ নিয়ে ঢাকা আসে এবং অসংখ্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে আসা জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করে। ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম ভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫শে মার্চ গণহত্যার জন্য বেছে নেওয়া হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরে অপারেশন সার্চলাইটের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালানো হয় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। এছাড়া পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে নির্বিচার হত্যা চালানো হয়। একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়েরবাজার, গণকটুলি, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার ন্যায় দেশের অন্যান্য শহরেও পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে।

এ পরিস্থিতিতে ২৬শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়।

দলীয় কাজ

বাঙালিরা কেন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে, তার কারণ অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

২০২৫

বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার

'অপারেশন সার্চ লাইট', এর নির্মম পরিকল্পনা মোতাবেক নিরস্ত্র বাঙালি জনতার ওপর আক্রমণের পরপরই পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে।

রাজনৈতিক সহকর্মীদের যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে বাসায় অবস্থানের কারণ বঙ্গবন্ধু ব্যাখ্যা করেছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারি সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে। বঙ্গবন্ধু বলেন, "... সে সন্ধ্যায় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, ওরা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপোসের আলোচনা করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো, না বেরুনো নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তানি বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি স্থির করলাম : আমি মরি, তাও ভাল, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।"

আবার সহকর্মীদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জানিয়ে নিজে আত্মগোপনে না যাওয়ার কারণ ২৫শে মার্চ রাতেই তিনি সহকর্মীদের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন বলে মওদুদ আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, শেখ মুজিব বলেন, "আমাকে সবাই চেনে। আমাকে গ্রেফতার করা হলে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো বিষয়টি গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমাদের কেউ চেনে না। কাজেই তোমাদের অবশ্যই কৌশলী হতে হবে।" জে.এন.দীক্ষিতের মতে, শেখ মুজিব ভেবেছিলেন তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। অন্য কারণ হলো, মুজিব আত্মগোপন করলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁর জনগণের ওপর আরও ভয়াবহ অত্যাচারে মেতে উঠবে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী হিসেবে কারাবরণ করাকেই তিনি যৌক্তিক বিবেচনা করেন। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা হেফাজতে নেবার পর ১০ই এপ্রিল ঘোষণা করা হলো– শেখ মুজিব তাদের হাতে বন্দি।

মূলত ওই ঘোষণা এবং করাচি বিমানবন্দরে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরই বাঙালিরা তাঁর বেঁচে থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং স্বস্তিবোধ করতে থাকে। ২৫শে মার্চ রাত একটা থেকে দেড়টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের তিন দিন পরে ২৯শে মার্চ বিমানযোগে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং লায়ালপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ) জেলে আটক রাখা হয়।

চিত্র-৭৩ : করাচি বিমানবন্দরে সেনা প্রহরারত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায়। শপথ

চিত্র-৭৪ : শপথ গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনারে সালাম নিবেদন

অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অনুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। এ সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়। তখন মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য ৬ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, কমরেড মণি সিং, শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দিন আহমদ এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী	এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান
পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	কর্নেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ	লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রব
ডেপুটি চিফ অব স্টাফ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার

বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীনে প্রশাসন ও যুদ্ধ

১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। এগুলো হচ্ছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ-শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ইত্যাদি। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম) বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্গঠিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং জেড, কে এবং এস নামে তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব সেক্টরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনাসদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল।

এসব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। যেমন: টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনী, মাগুরার আকবর বাহিনী ইত্যাদির কথা স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে আহত হয়েছেন, অনেকে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন।

দলীয় কাজ : মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও গণহত্যা

২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ জুড়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করে, এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী আর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। কারণ, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বিশ্বাস করত, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন-সংগ্রামের পেছনে হিন্দুদের হাত রয়েছে, আর এদের ইন্ধন জোগায় ভারত।

যদিও ২৫শে মার্চ 'জিরো আওয়ারে' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু করার কথা, তথাপি রাত সাড়ে এগারোটার দিকে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যে। ঢাকাসহ সারা দেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল,

জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল এবং বহু শিক্ষকের আবাসিক ভবনে তারা আক্রমণ করে অনেককে হত্যা করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে, পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার্সসহ রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ট্যাংক, কামান, মেশিনগান দিয়ে হামলা চালায়। শুরু হয় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যা। অসীম সাহস নিয়ে ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী অনায়াসে ভেঙ্গে ফেলে এই প্রতিরোধ।

পুরনো ঢাকার নবাবপুর, তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার এলাকায় বসবাসকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্রোধ যে বেশি ছিল, তা সেখানকার নিষ্ঠুর গণহত্যা, নির্যাতন আর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বোঝা যায়। আকস্মিক আক্রমণে নিরীহ, অসহায় নগরবাসী আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পায়নি।

চিত্র-৭৫ : মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা

সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর রোষানলে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. মুনীরুজ্জামানসহ অনেক শিক্ষক এবং শত শত ছাত্রকে হত্যা করা হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা দুই দিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে মারা যান।

কেবল রাজধানী ঢাকা শহর নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। দুই লাখের অধিক মা-বোন পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা বরেণ্য সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে পাকিস্তানের পক্ষের সহযোগী বাহিনী

১৯৭১ সালের জুন মাসে লে. জেনারেল টিক্কা খান 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। শুরুতে আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। পরে পাকিস্তানপন্থি অনেকে এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এই বাহিনী গঠনে জেনারেল নিয়াজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজাকারদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল এক সপ্তাহ। রাজাকারদের ট্রেনিং দিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। রাজাকার বাহিনী ছাড়াও আলবদর এবং আলশামস নামে আরও দুটি বাহিনী ছিল। এরাও বিভিন্নভাবে হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় প্রথম যে সংগঠনের জন্ম হয় তা হলো 'শান্তি কমিটি'। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া।

একক কাজ : পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিল কারা? তারা পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সংগঠিত হয়ে গণহত্যা ও নির্যাতনে কী ভূমিকা রেখেছিল এর ওপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যা

চিত্র-৭৬ : শরণার্থী-১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই সৃষ্টি হয় শরণার্থী সমস্যা। ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হলে প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার সন্ধানে লাখ লাখ মানুষ বিভিন্ন পথে পাশের দেশ ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের বড় অংশ আশ্রয় নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাকিরা ত্রিপুরা ও আসামে। ১৯৭১ সালের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩০৫ জন। শরণার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। শরণার্থী শিবিরগুলোতে ছিল খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধপত্রের স্বল্পতা। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান শরণার্থী সমস্যাকে জাতিসংঘের সামনে সমসাময়িক কালে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। বস্তুত, জাতিসংঘ সৃষ্টির পর বাংলাদেশ সংকটে জাতিসংঘ সবচেয়ে বড় মানবিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। শরণার্থী ইস্যুর ব্যাপকতাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতির জন্ম দিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৬ই মে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় বেশ কিছু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। ১৮ই মে রানীক্ষেতে এক জনসভায় ভাষণদানকালে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী সমস্যার ব্যাপকতা অনুধাবনের জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। ভারত শরণার্থীদের নিজে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি বহির্বিশ্বকেও সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছিল। জুন ১৯৭১ পর্যন্ত জাতিসংঘ ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। জাতিসংঘের ইতিহাসে এটা ছিল আকাশপথে সবচেয়ে বৃহৎ সাহায্য। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও সাহায্য পাঠান। ভারতে শরণার্থীদের অস্বাভাবিক আগমনে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। শরণার্থী শিবিরগুলো পূর্ণ হওয়ায় অন্যরা খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায় ফুটপাতে ও রেলস্টেশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ত্রিপুরায় ১৪ লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেয়, যা গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সমান ছিল। সেখানে স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়।

চিত্র-৭৭ : মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক

ছাত্র-ছাত্রী

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ছাত্ররা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোররাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের সংস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিসেনার দল।

চিত্র-৭৮ : স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীরা

কৃষক

মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা লাভের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন তারা। শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আক্রমণে তাঁরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। একটাই লক্ষ্য–যেকোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

নারী

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

চিত্র-৭৯ : স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরা

যুদ্ধের ৯ মাসে কয়েক লক্ষ নারী পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধর্ষণের শিকার হন। তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধু কন্যার মতো 'বীরাঙ্গনা' উপাধি প্রদান করলেও এদেশে তারা সামাজিকভাবে অত্যন্ত খারাপ জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। এর বাইরে বিশালসংখ্যক নারী মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে, নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এমনকি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও কম নয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন নারী 'বীরপ্রতীক' খেতাব অর্জন করেন। একজন তারামন বিবি, অন্যজন ডাক্তার সিতারা বেগম। সারা দেশে আরও অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন।

গণমাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসী বাঙালি

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তাঁরা কাজ করেছেন।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী

মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তথাপি, যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল প্রশংসনীয়। এমনকি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে

খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা, এম আর আকতার মুকুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'চরমপত্র' এবং 'জল্লাদের দরবার' ইত্যাদি অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। এসব অনুষ্ঠান রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করেছে।

জনসাধারণ

সাধারণ জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কিছুসংখ্যক দোসর ব্যতীত সবাই কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার ও ওষুধ সরবরাহ করেছে, সেবা দিয়েছে ও খবরাখবর সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি ভিন্ন জাতিসত্তার জনগণও অংশগ্রহণ করে। অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল অধিক। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীন মানচিত্র, লাল-সবুজ পতাকা।

মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্বাধীনতাবিরোধী এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রি এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

ভারতের ভূমিকা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য মূল কৃতিত্বের দাবিদার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর দূরদর্শিতা ও অসীম প্রজ্ঞার জন্য বাংলাদেশের দুঃসময়ে ভারত পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের বড় বড় শক্তির হুমকি উপেক্ষা করে ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় ও বিশ্বজনমত গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এজন্য তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন, অনেক নেতৃবৃন্দকে চিঠি লেখেন। তিনি প্রথমে নৈতিক, পরে পরোক্ষ এবং সবশেষে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেন ও সহযোগিতা করেন।

চিত্র-৮০ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের জনগণ ও সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তানের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে। ভুটান ও ভারত ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে

গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনি ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' (বিরোধিতা করা) প্রদান করে বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানিসহ তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিমা বিশ্ব ও অন্যান্য দেশের ভূমিকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, প্রতিরোধ, বাঙালিদের সংগ্রাম, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। উল্লেখ্য, লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। ব্রিটেন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচার মাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল; তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, চীন এবং ইরান ও সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তবে মার্কিন শিল্পী, সাহিত্যিক এবং অনেক রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন। পণ্ডিত রবি শংকরের উদ্যোগে আয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে ৪০,০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলানসহ বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ জোগানের ব্যবস্থা হয়।

জাতিসংঘের ভূমিকা: বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারত আমাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। বিশেষভাবে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে 'যৌথ কমান্ড' গঠন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ৬-১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

চিত্র-৮১ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

যৌথ বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পূর্বেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নৈতিক পরাজয় ঘটে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। আশ্চর্যজনক হলো যে সে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডার ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার উপস্থিত ছিলো না।

বাংলাদেশ নামের ইতিহাস

আমরা জানি, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। তবে সংবিধান অনুযায়ী নাম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই নামেরও একটা ইতিহাস আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশের নামের সঙ্গে ভূখণ্ডের সীমানার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর নানা সময়ে এর সীমানারও বদল হয়েছে।

প্রাচীনকালে আমাদের বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। তা এই গ্রন্থের শুরুর দিকে আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারত এবং গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমির লেখায় 'বাংলা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার অনেক পরে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম বাংলার তিনটি প্রধান কেন্দ্র লখনৌতি বা লক্ষণাবতী (গৌড়), সাতগাঁও (রাঢ়) ও সোনারগাঁ (বঙ্গ)-কে একত্র করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর স্বাধীনতা ২০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ইলিয়াস শাহের উপাধি ছিল 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ'। আর তখন থেকে সমগ্র বাংলা অঞ্চল 'বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলার পরিচয় হয় 'সুবাহ বাংলা' নামে। তবে, ইউরোপীয়রা বিশেষভাবে পর্তুগিজরা 'বেঙ্গালা' নামে অভিহিত করেছে এই অঞ্চলকে এবং ইংরেজরা বলত 'বেঙ্গল'।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলা নামে পৃথক প্রদেশ করা হয়। বাংলার অধীনে ছিল বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুর। পরে ১৯০৫ সালে বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। আন্দোলনের মুখে ৬ বছর পরে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে ইংরেজ সরকার। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান হলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে আর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলেও আজকের বাংলাদেশ 'পূর্ববঙ্গ' নামেই পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করলে বঙ্গবন্ধু এর বিরোধিতা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলা নামের দীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে। তাই বাংলার নাম পরিবর্তনের পূর্বে গণভোটের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের মতামত গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ।

জাতীয় পতাকার ইতিহাস

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আমাদের অহংকার আর গৌরবের প্রতীক। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে লাল-সবুজের এই পতাকা এদেশের জনগণ অর্জন করেছে। জাতীয় পতাকার সবুজ আয়তক্ষেত্র বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক, আর বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের রক্তের প্রতীক।

চিত্র-৮২ : মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় পতাকা

২০১৫

কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকায় লাল বৃত্তে সোনালি রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। মানচিত্র খচিত পতাকার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল এই ভূখণ্ডে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। মানচিত্র খচিত এই পতাকা আমাদের সংগঠিত, একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে জাতীয় পতাকা তৈরির নকশা করা হয়। এই পতাকা তৈরির কাজে ছিলেন শিব নারায়ণ দাস সহযোগী হিসেবে ছিলেন আ.স.ম. আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু ও কামরুল আলম খান খসরু। ১৯৭০ সালের ৬ই জুন গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) ১১৬ নং কক্ষে পতাকা তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। বলাকা বিল্ডিংয়ে তৃতীয় তলায় অবস্থিত পাক ফ্যাশন টেইলার্সে জাতীয় পতাকাটি সেলাই করা হয়।

১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চে যখন উত্তাল সারা দেশ, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পশ্চিম দিকের গেটে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ২রা মার্চ, ১৯৭১ সালে প্রথমবারের মতো উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব। এ যেন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যানের শামিল।

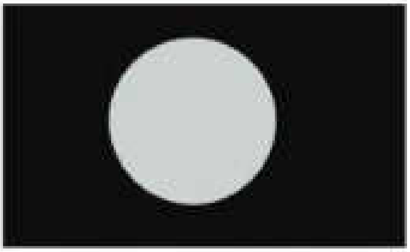

চিত্র-৮৩ : বর্তমান জাতীয় পতাকা

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হলো। বহু বাড়ি-ঘরে ওড়ানো হলো বাংলাদেশের পতাকা। পাকিস্তানের প্রত্যাখ্যাত পতাকা আর ফিরে আসতে পারেনি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে পটুয়া কামরুল হাসানকে দায়িত্ব দেন জাতীয় পতাকার নকশা চূড়ান্ত করার। পটুয়া কামরুল হাসানের হাতেই আমাদের জাতীয় পতাকা বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

জাতীয় পতাকা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জাতীয় পতাকার সম্মানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মান-মর্যাদা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে এই পতাকার সম্মান রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

একক কাজ : 'জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক'-এর পেছনের যুক্তিগুলো চিহ্নিত কর।

জাতীয় সংগীতের ইতিহাস

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'–সংগীতটি আমাদের জাতীয় সংগীত। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সংগীত রচনা করেন। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্বদেশি আন্দোলনের সময় এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)

চিত্র-৮৪ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের প্রাক্কালে গানটি গাওয়া হয়। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পরিবেশিত হয়। স্বাধীনতার পর সাংবিধানিকভাবে (অনুচ্ছেদ ৪.১) 'আমার সোনার বাংলা' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে

ঘোষিত হয়। গানের প্রথম ১০ লাইন কণ্ঠসংগীত এবং প্রথম ৪ লাইন যন্ত্রসংগীত হিসেবে পরিবেশনের বিধান রাখা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের আনুষ্ঠানিকতা

ক. স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও শহিদ দিবসের মতো বিশেষ দিনগুলোতে সম্পূর্ণ জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

খ. রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী যেসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন, সেসব অনুষ্ঠানে তাঁদের আগমন ও প্রস্থানের সময় সম্পূর্ণ জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

গ. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে গার্ড অব অনার প্রদানকালে রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন প্রদানের সময় পূর্ণ জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রথমে অতিথি দেশের জাতীয় সংগীত এবং পরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে। কিন্তু অতিথি সরকারপ্রধান হলে কেবল প্রথম চার লাইন পরিবেশিত হবে।

ঘ. বাংলাদেশে বিদেশি দূতাবাসগুলোর সরকারি অনুষ্ঠানে কেবল প্রথম চার লাইন পরিবেশিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রথমে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং পরে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

ঙ. রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও কূটনৈতিক মিশন আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠান, বিশেষ অনুষ্ঠান ও জনসভায় অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না-জানা শহিদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। সমগ্র স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদান

চিত্র-৮৫ : জাতীয় স্মৃতিসৌধ

ব্যবহার করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদিতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু-নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। এই সবকিছুই আসলে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতীক। পাশেই রয়েছে গণকবর, যাদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল, মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালের জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৮২ সালে তিনটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন হয়। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এই স্মৃতিসৌধ।

অপরাজেয় বাংলা

চিত্র-৮৬ : অপরাজেয় বাংলা

বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূর্তপ্রতীক অপরাজেয় বাংলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরে ৬ ফুট উঁচু বেদির ওপর নির্মিত। মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ–প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য অপরাজেয় বাংলা নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৭৩-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই ভাস্কর্যের নির্মাণকাজ চলে। এই ভাস্কর্যে অসম সাহসী তিনজন তরুণ-তরুণী মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুইজন তরুণ রাইফেল হাতে শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর ঔষধের ব্যাগ কাঁধে তরুণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। অপরাজেয় বাংলা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

চিত্র-৮৭ : মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় (যেখানে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল এবং স্থানটি বর্তমানে মুজিবনগর নামে পরিচিত) এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল হলো ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতীক। ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। একপর্যায়ে দৃঢ় মনোবল আর সংকল্প নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। কারণ এখানেই শপথ নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই স্মৃতিসৌধের স্থপতি ছিলেন তানভীর করিম।

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় অগণিত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মানবতাবিরোধী এই বর্বর কাজে সহায়তা করেছে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয়ের দুই দিন পূর্বে ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। তাদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এর স্থপতি ছিলেন মোস্তফা আলী কুদ্দুস। ১৯৭২ সালে এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শেষ হয়।

চিত্র-৮৮ : বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

শিখা চিরন্তন

মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চির জাগরূক রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে এই স্থান থেকেই 'মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের' ডাক দিয়েছিলেন। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এই শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয়।

চিত্র-৮৯ : শিখা চিরন্তন

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে অগণিত বধ্যভূমি ও গণকবর। তখন রায়েরবাজার এলাকাটি ছিল বেশ নিরিবিলি। জনবসতি খুব একটা চোখে পড়ত না। কালুশাহ পুকুরপাড় থেকে গোল মসজিদ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় তিন কিলোমিটার। মার্চ মাস থেকেই রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। এখানে মানুষকে শুধু হত্যা করা হয়েছে তা নয়, অগণিত লাশ এনে ফেলা হয়েছে এই বধ্যভূমিতে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এখানকার ইটখোলার রাস্তা দিয়ে লোকজন হাঁটাচলার সাহস করত না।

চিত্র-৯০ : রায়েরবাজার বধ্যভূমি

১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিন এই বধ্যভূমির বিভিন্ন গর্ত থেকে প্রচুর গলিত ও বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসকের লাশই অধিক ছিল। বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডে আলবদর ও রাজাকাররা প্রধান ভূমিকা পালন করে। রায়েরবাজারে উদ্ধারকৃত লাশগুলো এতটাই বিকৃত হয়ে পড়ে যে, পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তবে যে কয়েকজনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে, তাঁরা হলেন— অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, ডা. ফজলে রাব্বী, চক্ষু চিকিৎসক ডা. আলীম চৌধুরী প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

চিত্র-৯১ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা

১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় একটি ভাড়া বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে ১৬ই এপ্রিল ২০১৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার আগারগাঁও-এ নিজ ভবনে স্থানান্তরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে সচেতন করে তোলা। ফলে তারা মাতৃভূমির জন্য গর্ব অনুভব করবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হবে। পাশাপাশি উদার, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আটজন ট্রাস্টির উদ্যোগে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের সাথে মানুষের সমর্থন ও সহায়তায় সুনিপুণভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

গণহত্যা জাদুঘর

চিত্র-৯২ : দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা আরকাইভ ও জাদুঘর

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা-নির্যাতনের স্মৃতিকে জনমানসে তুলে ধরতে ২০১৪ সালে খুলনায় বেসরকারি উদ্যোগে সরকারি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর', সংক্ষেপে যেটি 'গণহত্যা জাদুঘর' নামে পরিচিত। এই গণহত্যা জাদুঘর দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র জাদুঘর যারা একাত্তরের নির্মমতার স্মৃতি সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও একাত্তরে সংগঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করে চলেছে। ১১ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে এটি পরিচালিত হয়। একাত্তরের গণহত্যায় শহিদদের নানা স্মৃতি স্মারক –এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ গণহত্যা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জাদুঘরের দেয়ালজুড়ে একাত্তরের আলোকচিত্র আর শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ, নির্যাতন আর গণহত্যার নির্মমতা। একাত্তরের ভয়াবহতা ও নির্মমতার চিহ্ন দেখে শিউরে ওঠেন জাদুঘর পরিদর্শনে আসা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশি ও বিদেশি পরিদর্শকবৃন্দ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন পেয়েছিল?

ক. ১৬৭   খ. ১৯৮

গ. ২৬৭   ঘ. ২৯৮

২. 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল–

i. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করায়

ii. জাতীয় পরিষদের আহূত অধিবেশন স্থগিত করায়

iii. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি ফি বৃদ্ধি করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের যৌক্তিক মুক্তিসংগ্রামে 'খ' রাষ্ট্র 'ক' রাষ্ট্রের অত্যাচারিত ও আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্রের ভূমিকা উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের ভূমিকার মতো ছিল?

ক. চীন খ. ভারত

গ. নেপাল ঘ. মিয়ানমার

৪. উক্ত রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মকাণ্ডের ফলে–

i. স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হয়

ii. মানবাধিকার রক্ষিত হয়

iii. বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের নির্যাতনের চিত্র প্রকাশিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রের পথিকৃৎ আব্রাহাম লিঙ্কন একটি স্মরণীয় নাম। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা তাঁকে বিশ্বের আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এভাবে একজন মেহনতী মানুষ নিজের প্রতিভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্বার্থান্ধ মানুষের পাশবিকতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'Government of the people, by the people, for the people'. আজও এ উক্তি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?

খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত বিষয়বস্তুতে কার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'গ'-এর উত্তরের উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি– মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।